নবীন বিজ্ঞানী

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃক প্রকাশিত
জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক
প্রকাশকাল ঃ ডিসেম্বর, ২০১৬

BANBOC Library
Dhaka

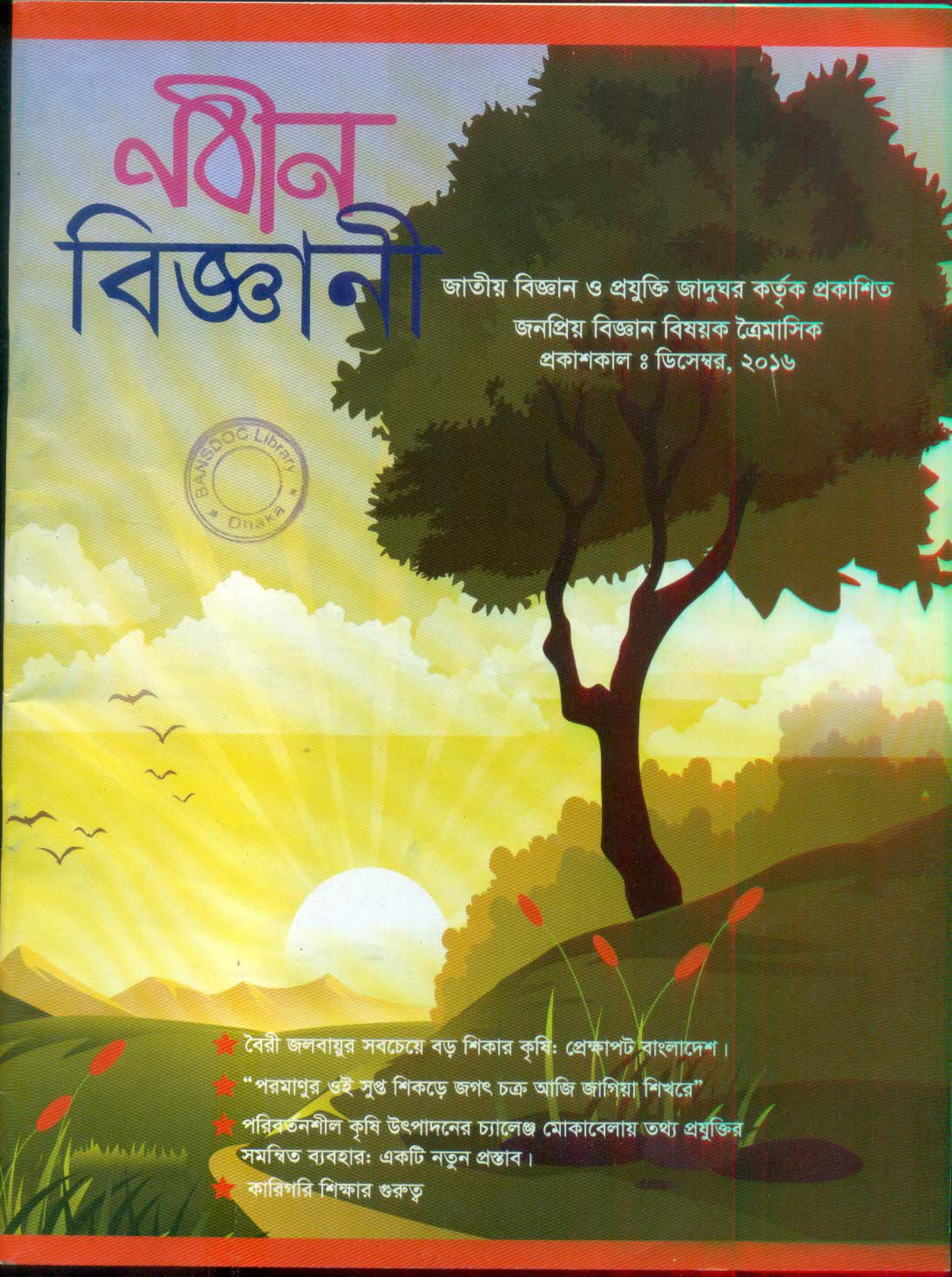

- বৈরী জলবায়ুর সবচেয়ে বড় শিকার কৃষি: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ।
- "পরমাণুর ওই সুপ্ত শিকড়ে জগৎ চক্র আজি জাগিয়া শিখরে"
- পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার: একটি নতুন প্রস্তাব।
- কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

নবীন বিজ্ঞানী

জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ক ত্রৈমাসিক

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর, ২০১৬

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি :
জনাব স্বপন কুমার রায়
মহাপরিচালক

সম্পাদকমণ্ডলী:
কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
কিউরেটর (সার্বিক)
জনাব মোঃ কামরুল ইসলাম
লাইব্রেরিয়ান
জনাব মোঃ মোহসীন মোল্লা
সহকারী কিউরেটর

প্রচ্ছদ :
জনাব সৌমিত্র কুমার বিশ্বাস
সিনিয়র আর্টিস্ট (অ. দা.)

অঙ্গসজ্জা / মুদ্রণালয় :
অনুপম প্রিন্টার্স
৫ শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা

প্রকাশনায় :
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

যোগাযোগের ঠিকানা :
মহাপরিচালক
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭ : ফোন : ৯১১২০৮৪
ই-মেইল : infomnst@gmail.com

সূচিপত্র

- কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব ১
  — মোঃ টিপু সুলতান
- যক্ষ্মা
  — প্রকৌশলী টিপু সুলতান
- হাঁস-মুরগির ডিম, গরুর মাংস ও দুধ উৎপাদনে হরমোন ব্যবহার
  — মোঃ খোরশেদ আলম
- খুব ঠাণ্ডায়, খুব জোরে দৌড়ায়
  — সুব্রত কুমার সাহা
- পলিমারের রাসায়নিক ধারণা ও ইতিহাস
  — আহসান হাবিব
- নতুন আবিষ্কার ও উদ্‌ঘাটিত মহাকর্ষ-তরঙ্গ
  — আজিজুল আলম
- "পরমাণু ওই সুপ্ত শিকড়ে জগৎজুড়ে আজি জাগিয়া শিখরে"
  — মোঃ রিদওয়ানুর রহমান
- পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার : একটি নতুন প্রস্তাব
  — শহিদুল ইসলাম
- আমের প্রধান রোগসমূহ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা
  — মোঃ নজরুল ইসলাম
- বৈরি জলবায়ুর সবচেয়ে বড় শিকার কৃষি : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ
  — কাজী রিচি ইসলাম

"নবীন বিজ্ঞানী" এর নিয়মাবলী

লেখক-লেখিকাদের জন্য

- রচনা বিজ্ঞানের যেকোনো বিষয়ে হতে পারে, তবে তা যেমন নবীনদের জন্য উপযোগী হতে হবে তেমনি তার ভাষা সহজ, সরল ও আকর্ষণীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার স্পষ্টাক্ষরে লিখে বা টাইপ করে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
- অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হবে না।
- রচনার মৌলিকত্ব বজায় রেখে অংশবিশেষ পরিবর্তন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন বা বর্জনের অধিকার সম্পাদকের থাকবে।
- রচনা মোটামুটি দুই থেকে তিন হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।
- রচনার সাথে ছবি দিতে হলে সেসব ছবি লেখককেই সরবরাহ করতে হবে। হাতে আঁকা ছবি হলে পৃথক কাগজে সেটি সুন্দরভাবে চাইনিজ কালিতে এঁকে পাঠাতে হবে।
- ভুল তথ্য ও মতামতের জন্য লেখক দায়ী থাকবেন, সম্পাদক নয়।
- প্রকাশিত রচনার জন্য লেখককে সম্মানী দেয়ার ব্যবস্থা আছে।

সম্পাদক

"নবীন বিজ্ঞানী"

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১১২০৮৪

ই-মেইল : infonmst@gmail.com

নবীন বিজ্ঞানী পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় সম্পাদক-এর সাথে যোগাযোগ করুন।

মুখবন্ধ

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর অনানুষ্ঠানিক বিজ্ঞান শিক্ষার একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। বিজ্ঞান মনস্ক জাতি গঠনে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর নিরন্তর প্রচেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর হইতে প্রকাশিত 'নবীন বিজ্ঞানী' নামক ত্রৈমাসিকের মাধ্যমে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার নিত্য নতুন তথ্যসমূহ তরুণ বিজ্ঞানী ও উদ্ভাবকগণের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হয় এবং তরুণ বিজ্ঞানীগণের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চিন্তা-চেতনাকেও অন্যদের মাঝে ছড়াইয়া দেওয়া হয়। প্রকাশনায় যে সকল বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞান লেখক প্রবন্ধ পাঠাইয়া এই প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাহাদের প্রতি রহিল অপরিসীম কৃতজ্ঞতা। প্রকাশনাটি বাস্তবরূপ দিতে যেই সকল সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তাহাদেরকেও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। আলোচ্য প্রকাশনার মান উন্নয়নে সকলের সুচিন্তিত পরামর্শ কাম্য। আশা করি ভবিষ্যৎ প্রকাশনাসমূহ আরো জ্ঞানগর্ভ তথা ও সমৃদ্ধভাবে প্রকাশিত হইবে। সকল শুভানুরাগীর জন্য অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

স্বপন কুমার রায়

মহাপরিচালক

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর।

কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব

মো: টিপু সুলতান

কারিগরি শিক্ষা নেব, বেকার মুক্ত বাংলাদেশ গড়বো। এই স্লোগানকে সামনে রেখে সারা দেশব্যাপি কারিগরি শিক্ষা সপ্তাহ উদযাপন হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান অগ্রসর বিশ্বের সাথে সঙ্গতি ও সমতা অর্জনের জন্য চুয়াডাঙ্গা জেলাতে বেশকিছু কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে একটি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। চুয়াডাঙ্গা জেলাতে দশ বছর আগে কারিগরি শিক্ষার তেমন প্রচলন ছিলো না। চুয়াডাঙ্গায় কিছু পলিটেকনিক কলেজের মাধ্যমে গুণগত মানের শিক্ষা গ্রহণ করে দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বিশ্বময় মানুষের সেবা দিবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার। বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনশক্তির পরিমাণ পাঁচ থেকে ছয় ভাগ। কিন্তু অপরপক্ষে জাপানে ৬০ ভাগ, তাই বাংলাদেশ ও জাপান উন্নয়নের দিক থেকে তুলনা করলে বাংলাদেশের পরিমাণ অতি নগণ্য। তাই আমাদের দেশের ছেলে/মেয়েদের কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই মানুষকে সমাজের ও রাষ্ট্রের জন্য যথার্থ জ্ঞান দক্ষতা দিয়ে একজন কর্মঠ মানুষ হিসেবে পরিকল্পিত উপায়ে ধাপে ধাপে প্রস্তুত করা হয়। বিশেষজ্ঞদের অভিমত হল জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য একটি বহুধা বিস্তৃতি ও সুবিন্যস্ত শিক্ষাকাঠামোর পাশাপাশি গুণগত কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষা অপরিহার্য যার মাধ্যমে কোন দেশের টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের উপর জোর দিয়ে বর্তমান সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১৪ ঘোষণা করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতিতে কর্মমূখী শিক্ষা যাতে শিক্ষা অর্জনের সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে সম্মানিত হয় তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি আত্ম-কর্মসংস্থান, বেকারত্ব, ক্ষুধা ও দুর্নীতিমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য কারিগরি বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণ অপরিহার্য। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড থেকে বর্তমানে ৬,৮৮১টি প্রতিষ্ঠানে ৫ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছে। দেশের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ যুব সম্প্রদায়। এই যুব সম্প্রদায়কে আত্মনির্ভরশীল ও যোগ্য জনশক্তিতে পরিণত করতে হলে কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নাই। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন ও কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে সম্ভব।

প্রযুক্তিগত শিক্ষার মাধ্যমে গড়ে উঠবে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করা হয়তো সম্ভব হয়নি।

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান, চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, চুয়াডাঙ্গা।

যক্ষ্মা

প্রকৌশলী টিপু সুলতান

যক্ষ্মা একটি সংক্রামণজনিত রোগ। আগে বলা হতো যক্ষা হলে মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু বর্তমানে বলা হয় যক্ষ্মা হলে রক্ষা নাই এই কথার ভিত্তি নাই। যক্ষ্মার প্রধান লক্ষণ হলো এক নাগাড়ে তিন সপ্তাহ কাশি। কাশির সাথে রক্ত থাকতেও পারে নাও পারে। বুকে ও পিঠের উপরে ব্যথা হওয়া। বিকাল থেকে অল্প জ্বর এবং রাতে শরীর ঘেমে জ্বর ছেড়ে যাওয়া। খাবারের অরুচি। ওজন কমে যাওয়া। এই লক্ষণগুলো দেখা দিলে ধরে নিতে হবে যক্ষ্মা হয়েছে। পূর্বে এই চিকিৎসা তেমন কার্যকরী তত্ত্বাবধান ছিল না। ফলে রোগী অপরিমিতি ও অনিয়মিত ঔষধ সেবন করত। এতে রোগী ভাল না হয়ে ঔষধ রেজিস্ট্যান্টস বেড়ে যেত ফলে এমডিআর যক্ষ্মা রোগীতে পরিণত হত। যক্ষ্মার চিকিৎসা পূর্বের সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য DOST পদ্ধতি চালু করা হয়।

D = Directly (সরাসরি) এখানে মুখোমুখি বা উপস্থিতিকে বোঝানো হয়েছে।

O = Observed (পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে) কারো উপস্থিতির মাধ্যম।

T = Treatment (চিকিৎসা) পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে রোগীর যক্ষ্মা চিকিৎসা ঔষধ সেবন।

S = Short Course (স্বল্পকালীন মেয়াদ) পুরো মেয়াদকাল কারো উপস্থিতিতে পর্যবেক্ষকের মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে।

যক্ষ্মা রোগ যেসকল ব্যক্তির হতে পারে :

* যাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম।
* যক্ষ্মা রোগীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা লোকজন।
* ডায়াবেটিক রোগীদের যক্ষ্মা রোগ হতে পারে।
* মাদকসেবী।
* বয়স্ক ব্যক্তি।
* যারা অপুষ্টিতে ভোগছেন।

যক্ষ্মা রোগ চিকিৎসা করা হয় সকল উপজেলা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে, সকল সদর হাসপাতালে নির্দিষ্ট এনজিও ক্লিনিক, ৪৪টি বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, ০৮টি বক্ষব্যাধি হাসপাতাল, জাতীয় বক্ষব্যাধি ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, নীলফামারী সরকারি কুষ্ঠ হাসপাতাল। এই সকল প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে যক্ষ্মা চিকিৎসা করা হয়। যক্ষ্মা রোগ দুই ধরনের হতে পারে। একটি হলো ফুসফুসে অপরটি হলো ফুসফুসের বাহিরে। যেমন– হাড়, চামড়া, গ্লান্ট, কিডনী ইত্যাদির যক্ষ্মার জীবাণু সংক্রামণ হয়ে থাকে। এই জীবাণুর যক্ষ্মা কাশির সঙ্গে বের হয়ে আসে এবং ফুসফুসের মাধ্যমে অন্য লোকের ফুসফুসে প্রবেশ করে যক্ষ্মা রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই যক্ষ্মা একটি বায়ুবাহিত রোগ প্রতি দুই মিনিটে একটি রোগী আক্রান্ত হয়। ১০ মিনিটে একটি রোগী মারা যায়। বছরে যক্ষ্মার কারণে প্রতি লাখে ৪৫ জন লোকের মৃত্যু ঘটে। বছরে প্রতি লাখে নতুন ও পুরাতনভাবে যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হয় ৪১১ জন, নতুন রোগে আক্রান্ত হয় ২২৫ জন। যার ৭০-৮০ ভাগই দরিদ্র। যক্ষ্মাই প্রতি বছর ১৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়।

"বছরে কমপক্ষে একজন যক্ষ্মা রোগীকে শনাক্ত করুন এবং তার পূর্ণ চিকিৎসা নিশ্চিত করুন।"

প্রবন্ধকার : বিভাগীয় প্রধান (ইলেক্ট্রিক্যাল), চুয়াডাঙ্গা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট; যুগ্ম সম্পাদক, জাতীয় যক্ষ্মা নিরোধ সমিতি নাটাব, ঢাকা, চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখা।

হাঁস-মুরগির ডিম, গরুর মাংস ও দুধ উৎপাদনে হরমোন ব্যবহার

মো: খোরশেদ আলম

ইদানিং বাংলাদেশে এমনকি সারা বিশ্বে শাক সব্জি, ফলমূলে, ডেইরি খামার, গরু মোটাতাজাকরণ খামার এবং পোলট্রি খামারে পশু পাখির দেহে ব্যাপকহারে হরমোন ব্যবহার করার গুঞ্জন শোনা যায়। বিষয়টি কতটুকু সত্য বা মিথ্যা তা যাচাই করে দেখা প্রয়োজন। অথবা হরমোন ব্যবহার করা হলেও তার মাত্রা এবং অতিরিক্ত ব্যবহারের প্রভাব জানা জরুরি। আমাদের সকলেরই এ ব্যাপারে পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

হরমোন : হরমোন হচ্ছে প্রাণিদেহের অভ্যন্তরে থাইরয়েড গ্রন্থি বা পিটুইটারি গ্রন্থির মত বিশেষ কিছু অঙ্গ হতে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ, যা দেহের অন্য কোনো অঙ্গ বা কোষের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। হরমোন প্রাণীদেহের খাদ্য পরিপাক, বিপাক, বৃদ্ধি প্রজনন ইত্যাদি কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হরমোনের প্রকারভেদ : হরমোন সাধারণত স্টেরয়েড এবং প্রোটিন- এ দু ধরনের হয়ে থাকে। স্টেরয়েড হরমোন পরিপাকতন্ত্রে সক্রিয় থাকে, জন্মনিয়ন্ত্রন বড়ির মত তা মুখে গ্রহণ করা যায়। প্রোটিন জাতীয় হরমোন ইনসুলিন নেয়ার মত ইংজেকশনের মাধ্যমে দেহের মাংসপেশীতে বা চামড়ার নিচে প্রয়োগ করতে হয়। ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টারন এবং টেস্টোস্টারন হচ্ছে প্রাকৃতিকভাবে তৈরি স্টেরয়েড হরমোন। জেরানল, ট্রেনবোলন এবং মেলেনজেস্ট্রল হচ্ছে কৃত্রিম হরমোন। জিন প্রযুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিকভাবে তৈরি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত রিকমবিনেন্ট বোভাইন গ্রোথ হরমোন এবং রিকমবিনেন্ট সোমাটোট্রফিন হরমোন অন্যতম। এ হরমোন ইনসুলিননির্ভর গ্রোথ ফ্যাক্টর (আইজিএফ-১) আমিষ তৈরির সূত্রপাতের মাধ্যমে ওজন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। জেরানল ট্রেনবোলনের সাথে বিভিন্ন হরমোনের মিশ্রণে তৈরি বাজারে অনেক কৃত্রিম হরমোন পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে দেহের ভেতরে তৈরি (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টারন ও টেস্টোস্টারন) হরমোন সহনীয় মাত্রায় ব্যবহার করলে কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয় না।

গবাদি পশুর খামারে হরমোন ব্যবহার : কিছু হরমোন আছে যা ব্যবহারে গাভীর দুধ উৎপাদন বৃদ্ধি এবং পশুর ওজন দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক গবেষণা ও তথ্য থেকে জানা যায়, হরমোন ব্যবহারে খামারীগন ১৫% ভাগ দুধ উৎপাদন এবং ২০% ভাগ পশুর দৈহিক ওজন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে খামারীগণ অল্প পরিশ্রমে এবং স্বল্প সময়ে অধিক লাভবান হতে পেরেছেন। ব্যাপকহারে না হলেও আমাদের দেশে কিছু কিছু ডেইরি ও গরু মোটাতাজাকরণ খামারে হরমোন ব্যবহারের গুঞ্জন শোনা যায়।

হাঁস মুরগির খামারে হরমোন ব্যবহার : প্রাকৃতিকভাবে তৈরি হরমোন (ইস্ট্রোজেন, প্রোজেস্টারন ও টেস্টোস্টারন) পরিপাক নালীর মাধ্যমে শোষণ হয় না। মাংসে বা চামড়ার নিচে ইমপ্ল্যান্ট করে ব্যবহার করতে হয়। পোলট্রি খামারে হাজার হাজার লেয়ার বা ব্রয়লার মুরগিকে আলাদা আলাদাভাবে হরমোন ইমপ্ল্যান্ট করা অত্যন্ত কঠিন, ব্যয়বহুল এবং অনেক শ্রমসাধ্য কাজ। একারণে লেয়ার বা ব্রয়লার মুরগি খামারে হরমোন ব্যবহারের কোনো সুযোগ নাই। পশু খাদ্যে এনজাইম ব্যবহারে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নাই। উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুণগত মান ঠিক রাখলে এনজাইম ব্যবহার পশুপাখির দেহের জন্য উপকারী। আমাদের দেশের অধিকাংশ পোলট্রি খাদ্যের সাথে এনজাইম ব্যবহার করা হলেও ব্রয়লার বা লেয়ার খামারে হরমোন ব্যবহারের কোনো সত্যতা পাওয়া যায়নি।

উন্নত দেশে হরমোন ব্যবহার : উন্নত দেশগুলোতে হরমোন ব্যবহার নিয়ে অনেক গবেষণার পরেও এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে পশুপাখির দেহে কৃত্রিমভাবে তৈরি স্টেরয়েড ইস্ট্রোজেন হরমোন যেমন, ডাই-ইথাইল স্টিলবেস্ট্রল ব্যবহারের ফলে অল্প বয়সী মহিলাদের দেহে বিশেষ করে বক্ষ ও যোনিপথে ক্যানসার হয় বলে ধারণা করা হয়। এ বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে আরও বেশি গবেষণা প্রয়োজন।

মন্তব্য : গবাদি পশুতে স্বল্প মাত্রায় প্রাকৃতিক হরমোন ব্যবহারে মানুষ এবং পশু পাখিতে মারাত্মক ক্ষতিকর কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া না থাকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্য, ঔষধ প্রশাসন এবং কৃষি সংস্থাসহ পৃথিবীর অনেক দেশে সরকারিভাবে সহনীয় মাত্রায় হরমোন ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। কোন কোন উন্নত দেশের এব্যাপারে কিছুটা ভিন্নমত রয়েছে এবং হরমোন ব্যবহার বন্ধ রয়েছে। পশু পাখির দেহে, ফসল ও শাক সব্জিতে হরমোন ব্যবহার করতে হলে এর সহনীয় মাত্রাজ্ঞান জানা থাকা খুব জরুরি। স্থানীয় কৃষি ও পশু পাখি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ ছাড়া কৃষি খামারীগণের পক্ষে সরাসরি হরমোন ব্যবহার না করাই উত্তম।

প্রবন্ধকার : মো: খোরশেদ আলম, কো-অর্ডিনেটর (অব:), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

খুব ঠান্ডায়, খুব জোরে দৌড়োয়

সুব্রত কুমার সাহা

১০ই জুলাই, ১৯০৮। লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন রয়েছেন একজন বিজ্ঞানী হেইকে ক্যামারলিঙ ওনস। তিনি ও তাঁর দলবল বেশ কিছুকাল ধরেই তরল হিলিয়াম তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। একদিন সফলতা এল। ১০ই জুলাই, ১৯০৮। তরল হিলিয়ামের তাপমাত্রা কত? চার দশমিক দুই ডিগ্রি কেলভিন। মজা কি জানো? ১৯০৮ সালে এই হৈ চৈ ফেলা কাণ্ড ঘটার পরেও দুনিয়া [illegible] সবটা বুঝে উঠতে পারেনি। পরের পনের বছর 'লিকুইড হিলিয়াম' পেতে হলে লেইডেন [illegible] আর কোথাও গিয়ে লাভ হত না। তরল হিলিয়াম থেকে কি 'কঠিন হিলিয়াম' তৈরি করা যায়? সবইতো প্রায় গ্যাস থেকে তরল, তরল থেকে কঠিন হয়। টানা পনেরো বছর এই নিয়ে [illegible] রইলেন। ১৯২২ সালের মাথায় হাল ছেড়ে দেন। দেয়াই উচিত ছিল। আর সবার মতন হিলিয়াম নয়। শত চেষ্টা করেও তাকে 'কঠিন' করা যাচ্ছে না। ক্যামারলিঙ তখন বেঁচে নেই। লেইডেনের [illegible] ছাত্রদল হিলিয়ামকে কঠিন করেছেন। তিরিশ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ দিতে হয়েছে।

হেইকে ক্যামারলিঙ ওনস

১৯২০ সালের পর লেইডেন ছাড়িয়ে হিলিয়াম গবেষণা ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় ছড়িয়ে [illegible] পরে যেখানে যতো কাজই হোক, স্রষ্টা ক্যামালিঙকে কিছুতেই ভোলা যায় না। নতুন এক দিক মানুষের কাছে রেখে গিয়েছেন। ক্যামারলিঙের জীবনকথা আমরা খানিকটা [illegible] চাই। [illegible] সালে তাঁর জন্ম। ১৯২৬ সালে জীবনাবসান হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ দেখেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখে যেতে পারেননি। গ্রটিনগেনে পড়েছেন। পরে হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে কারশভ ও বুনসেনের কাছে দু'বছর কাজ করেন। খুব ভাবতেন পৃথিবী যে ঘুরছে, নতুন প্রমাণ [illegible]। জীবনের [illegible] পথে নানা মানুষের সাথে দেখা হয়। ফলে অনেক ভাবনার মোড়ও পাল্টে যায়। ১৮৮২ সালে লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে যোগ দেন। পৃথিবীর চলন আর তাকে ভাবায় না। অন্য ভাবনায় চলে যান। খুব নিচু তাপে পদার্থের ধর্ম পরীক্ষায় মেতে উঠেন। আগে বলছি ১৯০৮ সালে তরল হিলিয়াম তৈরি হল। ১৯২৬ পর্যন্ত সারা পৃথিবী নিম্ন-তাপাঙ্ক পদার্থবিদ্যা নিয়ে শেষ কথা

বলার দায়িত্ব ক্যামারলিংকেই দিয়েছিল। তাঁর জীবদ্দশায় পৃথিবীতে কেউই তাকে ছাড়া [illegible] ১৯০৮ থেকে ১৯১১। তিন বছরের ফারাক। বছরটাও একটা অবস্থান আছে মাঝামাঝি [illegible] ১৯০০ সালে কোয়ান্টাম তত্ত্ব তৈরি হবার পর এগারো বছর কেটেছে। কোয়ান্টাম [illegible] হবার পনেরো ষোলো বছর বাকি। এই মাঝামাঝি সময়ে ক্যামালিঙের উদ্ভাবনার [illegible] নেই। ১৯১১ সালে তিনি প্রথম সুপার কনডাকটিভিটি আবিষ্কার করেন। পারদ, টিন, সীসা [illegible] নিচু তাপে সুপরিবাহিতা ছাড়িয়ে অতিপরিবাহিতা ধর্ম অর্জন করে। ১৯১৩ সালে তিনি [illegible] পান, তখন এই কাজ কেউ ভেবে দেখেনি। তরল হিলিয়াম তৈরির জন্য নোবেল [illegible] প্রায়োগিক মেধা নয়, তত্ত্বীয় ভাবনাতেও অসামান্য ছিলেন ক্যামারলিঙ।

পারদ, টিন, সীসা-এই খুব নিচু তাপে সুপরিবাহিতা ছাড়িয়ে অতিপরিবাহিতা ধর্ম অর্জন [illegible]

হিলিয়াম নিয়ে পাহাড় প্রমাণ কাজ করেছিল তিনি। একমাত্র তরল যা তার নিজস্ব [illegible] অবস্থায় পৌছায় না। ২.২ ডিগ্রি ক্যালভিন তাপাঙ্কে দু'দশার হিলিয়াম পাওয়া [illegible] হিলিয়াম-II, হিলিয়াম-II দশাকে অতিপ্রবাহী বা সুপারফ্লুইডিটির উদাহরণ হিসেবে [illegible]

১৯৩২ সাল। ভিল্লেম কিসম আর তাঁর কন্যা এ.পি.কিসম খুব সাবধানে মনোযোগী হয়ে [illegible] এর রূপান্তর তাপাঙ্কে (২.২°k) হিলিয়ামের নানা ধর্ম পরীক্ষা করেন। আশ্চর্য, এক অবস্থা [illegible] অবস্থায় যাচ্ছে হিলিয়াম। লীনতাপের বালাইও নেই। লীনতাপের বালাই নেই বটে, আপেক্ষিক [illegible] কিন্তু লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। যাই হোক, আমরা আর এক্ষুণি হিলিয়ামের আলোচনায় [illegible] না। অন্য বিষয়ে চলে যাচ্ছি। ক্যামারলিঙ নিজেও বেশিদিন হিলিয়ামের জগতে রইলেন না। [illegible] কমালে বাড়ালে ধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতার কি পরিবর্তন হয়, এই নিয়ে কাজ করতে থাকলেন। বিশ্বাস ছিল তাঁর, চরম শূন্য তাপমাত্রায় যে কোনো তড়িৎ পরিবাহীর রোধ শূন্য হয়ে যাবে। হ্যাঁ বিশ্বাস [illegible] প্রমাণ ছিল না হাতের কাছে কোন। প্লাটিনাম নিয়ে কাজ শুরু করলেন। ফলাফল কেমন [illegible] পারদে মন দিলেন। এমনিতে তরল, তবে ধাতু। প্রমাণ পেলেন। ১৩.৯ ডিগ্রি কেলভিনে কঠিন পারদের চেয়ে রোধ অনেক কম। আসল রোধের ০.০৩৪ ভাগ। তাপমাত্রা কমিয়ে ৪.৩ কেলভিনে নিয়ে [illegible] রোধ দাঁড়ায় ০.০০১৩ ভাগ। তিন ডিগ্রি কেলভিনে রোধ বলতে গেলে কিছুই থাকে না। আসল রোধের ০.০০০১ ভাগ। মাপাও হল ঠিকঠাক। রোধ দাঁড়াল ৩ × ১০^৬ ওহম। ফলে বিজ্ঞানের এই নতুন অধ্যায়ের একটা নাম তৈরি হল। অতিপরিবাহিতা। সুপারকনডাকটিভিটি।

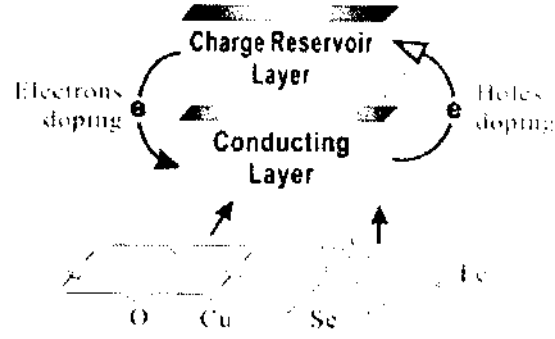

A view of structural unit of high-temperature cuprate- and iron selenide-based superconductors

যেমন তরল হিলিয়ামের কাজ, তেমনি অতিপরিবাহিতার কাজও ১৯২৩ সাল পর্যন্ত লেইডেন ছাড়িয়ে কোথাও যায়নি। নতুন নতুন কথা তৈরি হতে থাকল। খুব বেশি প্রবাহমাত্রা একসাথে পাঠিয়ে দিলে কখনও কখনও অতিপরিবাহিতা ধর্ম নষ্ট হয়ে যায়। চৌম্বক বলের মানও যদি একটা জায়গায় না বেঁধে রাখা যায়, তার প্রভাবে অতিপরিবাহিতার মরণ ঘটে। অতিপরিবাহিতা পারদ, সীসা, টিনে দেখা গেল। সোনা বা প্লাটিনামে দেখা গেল না।

লেইডেনের পর জার্মানির বার্লিনে ও কানাডার টরেন্টোতে এই নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল। আরও বহু ধাতুর অতিপরিবাহী ধর্ম বেরোল। নায়োবিয়াম সেই হিসেবে চমৎকার। ৮.৪ কেলভিনের নিচে নামতে হয় না। এই তাপমাত্রাতেই রোধ শূন্যের কাছে চলে যায়। ধাতু ছেড়ে সংকর ধাতু ও নানা রাসায়নিক যৌগে এই ধর্ম পরীক্ষা চলতে থাকল। দেখা গেল, কপার সালফাইড যৌগ চমৎকার অতিপরিবাহী ধর্ম দেখাচ্ছে। সোনা আর বিসমাথের সংকর মিশ্রণ অতিপরিবাহী ধর্ম দেখাচ্ছে। অনেকে এককভাবে এই ধর্ম না দেখাতে পারলেও মিশ্রণ বা যৌগে ওই ধর্মের আবির্ভাব ঘটছে। এই ঘটনা দেখে একটা কথা বোঝা গেল পরিষ্কার। কোন একরকম মৌলের পরমাণুকে ঘিরে এই অতিপরিবাহিতা ধর্ম ঘুরপাক খায় না।

১৯৩২ সালে বার্লিনের গবেষণাগারে ওয়াল্টার মিসনার একটা মৌলিক বিষয় জানতে চাইলেন। তড়িৎ মানেতো ইলেকট্রিক প্রবাহ। সাধারণ তড়িৎ-এর বেলায় যেমন ইলেকট্রন প্রবাহিত হয়, অতিপরিবাহিতার বেলাও কি সেই ইলেকট্রনগুলোতে পরিবাহীর গা ধরে এগোয় না কি ধাতুর পরমাণুতে যে ইলেকট্রন ভাঁড়ার, সেই ভাঁড়ারে হাত পড়ে? বিদ্যুৎ যে পরিবাহীর উপরতল দিয়ে যায়, এই কথা মাইকেল ফ্যারাডে আমাদের বহুদিন আগে শুনিয়েছেন। অতিপরিবাহীর বেলায় কি হয়? উপরতল দিয়ে যায় নাকি সারা পরিবাহী দিয়ে ইলেকট্রন স্রোত এগোয়? কি বললেন মিসনার? একটা অতিপরিবাহী আর সাধারণ পরিবাহী যদি পরস্পর জুড়ে দেওয়া হয়, অতিপরিবাহীর ইলেকট্রনগুচ্ছ অতিপরিবাহীর প্রান্তে এসে থমকে যায়। পরিবাহীর রাজ্যে প্রবেশ করে না। আজ আমরা জানি, কথাটা সঠিক ছিল না। তাই বলে মিসনার ইতিহাসের বিচারে অপাংক্তেয় হয়ে যান না। বিকাশের ধারাবাহিকতায় তাঁকে মনে রাখতেই হয়। প্রশ্ন তুলেছিলেন মিসনার আরও, পরিবাহী থেকে

অতিপরিবাহী চেহারায় পৌঁছুলে বিদ্যুৎ ধর্মের যেমন হঠাৎ পরিবর্তন ঘটে, অন্যান্য ভৌতধর্মের কি তাই ঘটবে? না। তা ঘটে না। পরিবাহী থেকে অতিপরিবাহিতায় এলে তাপ পরিবাহিতার স্বাভাবিক পরিবর্তন চোখে পড়ে। এতোসব কান্ডকারখানার জবাব সব সেসময় মিসনার দিতে পারেননি, তবে আজ বিজ্ঞানীরা আমাদের দেখিয়েছেন। সব জবাব পেতে চাইলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা এমনকি কোয়ান্টাম তড়িৎ গতিবিদ্যার আশ্রয় নিতে হবে। এগিয়েছিলেন কেউ কেউ। এমন কি নীলস বোর, ফেলিক্স ব্লকের মতো বিজ্ঞানীরাও এগিয়েছিলেন। তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে বুঝলেন, চলবে না। ছাপাতে পারতেন, ভুল জিনিস ছাপতে চাইলেন না। দু'জন বিজ্ঞানীর দুটো ভাবনা এখন মোটামুটি জমির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা ফেলিক্স ব্লকের ভাবনা-ই। বিস্ময় মেধার সোভিয়েত বিজ্ঞানী ল্যান্ডাউ ও পরে ফ্রেঙ্কেল তাকে পরিপূর্ণ করেছেন। অন্যমতটা দিয়েছিলেন ক্রনিগ, ফ্রেঙ্কেল ও নীলস বোর। এই মতগুলো ছাপা হয়েছে বাতিল হয়নি। অতিপরিবাহিতার কারণ কি জানতে চেয়ে নানা দেশে বহু বিজ্ঞানী কাজ করেছিলেন। মিসনারের ভাবনা নিয়ে জার্মানিতে কাজ করেছিলেন ম্যাক্স ভন লুই। অবর্ণণীয় নির্যাতন তাঁকে সইতে হয়েছিল নাৎসিদের হাতে। সে কথায় এখন যাচ্ছি না।

১৯৩২-৩২ সাল। হিটলারের অভ্যুদয় ঘটছে। একদল ইহুদি পদার্থবিদ, যারা অতিপরিবাহিতা নিয়ে কাজ করছিলেন, অক্সফোর্ডে লিন্ডেম্যানের ডাকে চলে গেলেন। লন্ডনের ক্যারেনডন ল্যাবরেটরি সেসময় অতিপরিবাহিতা গবেষণার মূল জায়গা হয়ে উঠল। বার্লিনের গবেষণাগার মুখ থুবড়ে পড়ল। মিসনার মিউনিখে চলে গেলেন। ভন লুই চাকুরি থেকে বরখাস্ত হলেন। সোভিয়েত সেসময় নিম্ন তাপমাত্রা পদার্থবিদ্যা গবেষণায় পৃথিবীর পথিকৃত ভূমিকা পালন করছিল। সেখানে তখন রয়েছেন পৃথিবীর সেরা বিজ্ঞানীদের একজন, পিটার ক্যাপিৎজা। একসময় কেমব্রিজে রাদারফোর্ডের ছাত্র ছিলেন। দেশে ফিরে গিয়ে দেশের বিজ্ঞান পরিকাঠামো গড়ে তুলেছেন। কেমন রাজনীতি কাজ করেছে তাঁকে নিয়ে। আজ ভাবলে অবাক লাগে। স্টালিনের কাছে আবেদন নিবেদন করছেন বাইরের বিজ্ঞানীরা। ক্যাপিৎজাকে ইউরোপে চলে আসতে দিন। এমন মেধা ছাড়া বিজ্ঞান ক্ষতিগ্রস্থ হয়। স্টালিন সেসময় বিনীত জবাব দিয়েছিলেন। প্রাজ্ঞ এই বিজ্ঞানী সোভিয়েতের অহংকার, তিনি নতুন সোভিয়েত তৈরি করেছেন। যাকে ছাড়া 'ইউরোপে বিজ্ঞান চলে না' তাঁকে অপেক্ষাকৃত এক তরুণ বিজ্ঞানীর সাথে প্রবীণত্বের শেষ প্রান্তে যাবার পর নোবেল দিয়ে সম্মানিত করা হল। আশ্চর্যের নয় কি? সোভিয়েতের কারকভ গবেষণাগারে অতিপরিবাহিতা নিয়ে একাধিক যুগান্তকারী কাজ হয়েছে। কাজের মধ্যমণি ছিলেন সুভনিকভ।

১৯৩৩ থেকে ১৯৪৫ সাল সময়টুকু জুড়ে অতিপরিবাহী সংকর ধাতুর উপর গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা আগেই দেখেছিলেন, অতিপরিবাহীর চারপাশে যদি চৌম্বকক্ষেত্র একটা মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে আর তার অতিপরিবাহিতা ধর্ম থাকে না। একে আমরা বলছি ক্রিটিকাল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। সংকট চৌম্বক ক্ষেত্র। প্রতিটি অতিপরিবাহী পদার্থের বেলায় এই মানটুকু জানা জরুরি। সুভনিকভ এই নিয়ে প্রচুর কাজ করেছিলেন। নানা যৌগের অতিপরিবাহী হবার তাপমাত্রা বিভিন্ন। তাপমাত্রাটুকু উপরের দিকে হলে কাজের সুবিধে হয় ১৯৪১ সালে বার্লিনের গবেষকদল দেখিয়েছিলেন, নায়োবিয়ামের বেলায় এই তাপমাত্রা ১৫ ডিগ্রি কেলভিন। ধীরে ধীরে আরও খবর জানা গিয়েছে। এখন ১৬-২৪ ডিগ্রি কেলভিনের আওতায় একগুচ্ছ অতিপরিবাহী পদার্থ এসে গিয়েছে।

অতিপরিবাহিতা নিয়ে গবেষণাপত্র বাড়ছে দিন দিন। একসাথে কোথাও কিছু পাওয়া যাচ্ছিল না। ১৯৫০ সালে ফ্রিৎজ লন্ডন নর্থ ক্যারোলিনার ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ে রয়েছেন। আগেই বলেছি, এই গবেষণায় সোভিয়েত সবাইকে হারিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। গিনজবুর্গ আর ল্যান্ডাও উঁচুমানের কাজ করলেন। ল্যান্ডাওয়ের সহকর্মী জাভারিৎস্কি ও ছাত্র আবরিকসভ এই গবেষণা আরও এগিয়ে নিয়ে যান। এখানেও আবার আশ্চর্যই হতে হয়। অতো বড়ো মাপের বিজ্ঞানী ল্যান্ডাও, তাঁর তত্ত্ব নিয়ে ইউরোপ আমেরিকা মাথা ঘামায় না।

১৯৫৬ সাল অতিপরিবাহিতার জগতে একটি যুগান্তকারী বছর। তিন বিজ্ঞানীর তত্ত্ব অতিপরিবাহিতার কারণকে শক্ত জমির উপর দাড় করাল। এই তত্ত্বের তিন প্রণেতা জন বার্ডিন, লিও কুপার ও রবার্ট শ্রিফার। এঁদের জীবনকথা খানিকটা করে জানলে তোমাদের ভালোই লাগবে। **জন বার্ডিন** (১৯০৮-১৯৯১) ইউসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছিলেন। ভূ-পদার্থবিদ হিসেবে গালফ রিসার্চ ল্যাবে তিন বছর চাকুরি করেরেছন। ১৯৩৬ সালে হার্ভার্ডে ভিগনারের কাছে গবেষণায় যোগ দেন। গাণিতিক পদার্থবিদ্যায় ডক্টরেট করেন। অল্প কিছুদিন এদিক ওদিক কাটিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বার্ডিন বেল ল্যাবে যোগ দেন। ১৯৫১ সালে ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় চলে যান। ১৯৫৬ সালের কথা। সে বছরই পয়েন্ট কনটাক্ট ট্রান্সজিস্টরের আবিষ্কর্তা (১৯৪৭) হিসেবে আরও দু'জনের সাথে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পেয়েছেন। আবার সে বছরই অতিপরিবাহিতা ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য 'BCS' তত্ত্ব আবিষ্কৃত হল। বুঝতেই পারছো। 'BCS' বলতে বার্ডিন, কুপার আর শ্রিফারের নাম যোগ করা হয়েছে। ১৯৭২ সালে এই কাজ তাঁকে দ্বিতীয়বার নোবেল এনে দেয়। এই প্রথম পদার্থবিজ্ঞানে অবদান রেখে একজন বিজ্ঞানী দু'বার নোবেল পেলেন।

কুপারের জন্ম ১৯৩০ সালে। লিও নীল কুপার। কলম্বিয়ায় পড়াশুনা করেন। ১৯৫৪ সালে কোয়ান্টাম ক্ষেত্রতত্ত্বের উপর গবেষণা করে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। নিম্ন তাপাঙ্কে 'জোড়-ইলেকট্রন' এর অস্তিত্বের সন্ধান দেন কুপার। জানি আমরা। এক ইলেকট্রন অন্য ইলেকট্রনের ধারে কাছে থাকার কথা নয়। তবে জোড় ইলেকট্রন কেন? একটা ঢালু জায়গায় পাতা কার্পেটের উপর যদি পাশাপাশি দুটো কামানের গোলা রেখে দেয়া যায়, কি হবে? পাশাপাশি থেকেই গড়াতে থাকবে। এই ইলেকট্রন জোড় তেমনি। এদের বলা হয় 'কুপার'স জোড়। একটা অতিপরিবাহী পদার্থের কেলাসে এই জোড় এগিয়ে যায়। একটু বিচ্ছুরণ ঘটে না। অবিশুদ্ধ পরমাণু থাকলেও তার চেয়ে এই জোড়ের অধিকৃত এলাকা এত বড় যে কিছুই করে উঠতে পারে না। বার্ডিন কি বলেছিলেন? বি.সি.এস. তত্ত্বের প্রথম পুরুষহতো বার্ডিন। একটু ধাতুর তৈর কেলাসে পরমাণুগুলোর আন্দোলন (অসিলেশন) তো থাকেই। বার্ডিন বললেন, এই আন্দোলনগুলো ধাতুর ভেতরকার পরিবাহী ইলেকট্রনগুলোর সাথে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় যোগ দেয়। জন রবার্ট শ্রিফার জন্মেছেন ১৯৩১ সালে। তিনিও ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। এম.আই.টি.তে পড়েছেন। পরে ইলিনয়ে যোগ দেন। বার্ডিনের কাছে ডক্টরেট করেছেন। অর্ধপরিবাহীর উপরতলে তড়িৎ পরিবহনের চরিত্র নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। গবেষণা

করলেন একেবারে অতিপরিবাহিতার উপর। ১৯৬৪ সালে পেনসিলভানিয়ায় অধ্যাপক [illegible] যাকে বলছেন 'ইলেকট্রন জোড়', শ্রিফার তার উপর কোয়ান্টাম বলবিদ্যার ধারণা আরোপ করেছেন। প্রতিটি 'ইলেকট্রন জোড়' তার মতে এক একটি 'ওয়েভ ফাংশন' ছাড়া কিছুই নয়।

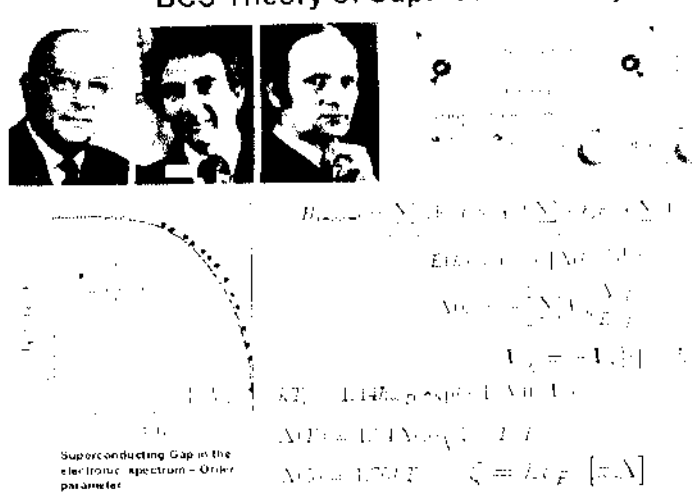

অতিপরিবাহিতা ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য 'BCS' তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় 'BCS' বলতে বার্ডিন, কুপার আর শ্রিফারের নাম [illegible] হয়েছে

অতিপরিবাহিতা নিয়ে পৃথিবীর সব দেশেই গবেষণা চলছে। নতুন নতুন যৌগের কথা জানতে পারছি আমরা। নজর থাকে একটা তাপাঙ্কের দিকে। কত ডিগ্রি কেলভিনে এসে এই ধর্ম দেখায়। বেশির দিকে হলে আনন্দের সীমা থাকে না।

১৯৮৬ সালে আলেক্স মুলার আর জর্জ বেডনর্জ আমাদের জানিয়েছিলেন এমন অতিপরিবাহী তারা বানিয়েছেন যা তিরিশ ডিগ্রি কেলভিন পর্যন্ত অতিপরিবাহী থাকে। মোট তিন ধাতুর অক্সাইডের মিশ্রণ। ল্যান্থেনাম, ক্যালসিয়াম আর তামার অক্সাইডের মিশ্রণ থাকে। বেশিদিন গেল না, নব্বই ডিগ্রি কেলভিনে অতিপরিবাহিতা দেখাতে পারে এমন যৌগ মিশ্রণেরও সন্ধান দিলেন বিজ্ঞানীরা। ইটরিয়াম, বেরিয়াম আর তামার অক্সাইড মিলিয়ে এই অতিপরিবাহী তৈরি করতে হয়। কিছুকাল আগে পারদের অক্সাইড দিয়ে এক অতিপরিবাহী তৈরি করা গিয়েছে যে ১৩৩ ডিগ্রি কেলভিনে অতিপরিবাহী থাকে। একেবারে সম্প্রতি একটা 'পারদ-বেরিয়াম-ক্যালসিয়াম কপার অক্সাইড' অতিপরিবাহী জানা গিয়েছে যার ১৬০ ডিগ্রি কেলভিনেও অতিপরিবাহিতা গুণ নষ্ট হয় না। ১৯৮৭ সালে এমন পরিবাহীর কথা জানা গিয়েছে যা ২৪০ ডিগ্রি কেলভিনেও পরিবহন করতে পারে। এক যৌগ থেকে অন্য যৌগে গেলে অতিপরিবাহী হিসেবে বেঁচে থাকবার তাপমাত্রা এমন পাল্টে যায় কেন? কোথাও ৩০ ডিগ্রি কেলভিন, কোথাও ৯০ ডিগ্রি কেলভিন, কোথাও ১৩৩ ডিগ্রি কেলভিন,

কেন? কেন? আজও জানা নেই। একুশ শতকে পদার্থবিদদের যে ক'টি জরুরি বিষয় অনুসন্ধান করতে হবে তার অন্যতম এই অস্পষ্টতা। জানতেই হবে আমাদের। যেই অতিপরিবাহী আমাদের প্রযুক্তিজগতের বিপ্লব এনে দিয়েছে তার কারণ না জানলে চলবে কেন?

কিসের বিপ্লব? একটা দুটো বলি। তামা-নায়োবিয়াম আর টাইটেনিয়াম-এই ত্রয়ী মৌলের একটা অতিপরিবাহী হয়। ভালো পরিমাণ চৌম্বকক্ষেত্রের প্রভাবেও ভেঙে পড়ে না। দশ টেসলা চৌম্বক ক্ষেত্রে পাঠাও। কিছুই হবে না। ফলে আজকাল এন.এম.আর মেশিনে এই অতিপরিবাহী কাজে লাগানো হয়। খুব বেশি চৌম্বকবলের অধীনে ইলেকট্রন কেমন আচরণ করে বুঝতে চাইলেও এই অতিপরিবাহী ব্যবহার করা হয়। এখন যে কণা পদার্থবিদ্যার দশাসই সব গবেষণা চলছে, সেই গবেষণার অপরিহার্য অঙ্গ কি? কণা ত্বরকযন্ত্র। পার্টিকল অ্যাকসিলারেটর। অতিপরিবাহী ছাড়া এই যন্ত্র অচল। চিকিৎসার কাজে উন্নততম উদ্ভাবনা ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিং (MRI)। এই মেশিনটাও অতিপরিবাহী ছাড়া চলে না। ইলেকট্রিক মোটর, পাওয়ার জেনারেটর এসবেতো লাগেই। বিদ্যু স্থানান্তরকরণের কাজে এখন বিসমাথ-স্ট্রনসিয়াম অক্সাইড-ক্যালসিয়াম-কপার, এই চারমূর্তির তৈরি অতিপরিবাহী কাজে লাগানো হয়। ৪.২ ডিগ্রি কেলভিনে তার নায়োবিয়াম ঘটিত অতিপরিবাহীর চেয়ে বেশি চৌম্বকক্ষেত্র সইবার ক্ষমতা থাকে। সেটাও একটা ভালো দিক। পৃথিবীর সবচেয়ে যে শক্তিশালী ত্বরকযন্ত্র, সেখারকার চুম্বক অতিপরিবাহী তারে জড়ানো রয়েছে। তা না বলে ক্যাবল বললেই ভালো হয়। কুড়ি থেকে চল্লিশটা নায়োবিয়াম-টাইটেনিয়াম তার সমান্তরালভাবে রয়েছে সেখানে। প্রতিটি তারে পাঁচ হাজার থেকে দশ হাজার ফিলামেন্ট। এক একটা ফিলামেন্ট একাই দশ হাজার অ্যাম্পিয়ার প্রবাহমাত্রা বইতে পারে।

অতিপরিবাহী কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর প্রথম ত্বরকযন্ত্রটি ১৯৮৪ সালে তৈরি হয়েছিল। নাম টেভট্রন (Tevatron)। কোথায় তার ঠিকানা? ফার্মি ন্যাশনাল অ্যাকসিলারেটর ল্যাবরেটরি। এর ভেতর ৮০০টি অতিপরিবাহী তার জড়ানো চুম্বক কাজ করে। এরপর আরও অনেক অনেক ত্বরকযন্ত্র তৈরি হয়েছে। জার্মানিতে হেরা (HERA) হয়েছে। রিলেটিভিস্টিক হেভি আয়ন কলাইডার ব্রুকহেভেন ন্যাশনাল ল্যাবে তৈরি হচ্ছে। এখনও তার কাজ শেষ হয়নি। জেনেভার সার্ন (CERN)-এ তৈরি হয়েছে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার (LHC)। চৌদ্দ টেভট্রন চৌম্বকক্ষেত্র পাওয়া যাবে। যা দিয়ে কোন কণাকে প্রচন্ড উত্তেজিত করে ধাক্কা মারতে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে। MRI মেশিনের কথা বলছিলাম। নানা দেশে এই মেশিন অনেক রয়েছে। এক একটা যন্ত্র প্রায় একশো কিলোমিটারের কাছাকাছি অতিপরিবাহী তারে জড়ানো থাকে। চুম্বককে ঠান্ডা রাখলে তরল হিলিয়াম কাজে লাগানো হয়। একবার চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হয়ে গেলে তার স্থায়িত্ব এমন যে আমরা ভাবতেও পারি না। এক বছরে দশ লক্ষ ভাগের এক ভাগ চৌম্বকশক্তিও নষ্ট হয় না। মস্তিষ্কের পুরো ছবি তুলতে চাইলে এর কাছে যেতেই হবে।

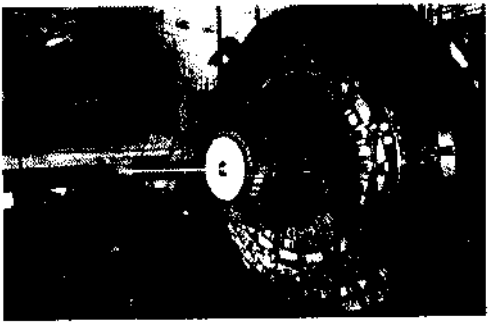

জেনেভার সার্ন (CERN)-এ তৈরি হয়েছে লার্জ হ্যাড্রন কলাইডার (LHC) যা দিয়ে কোন কণাকে ...
মারতে পাঠিয়ে দেওয়া যাবে

'Squids' : পুরোটা বললে দাঁড়ায় সুপারকনডাকটিং কোয়ান্টাম ইনটারফারেন্স ডিভাইসেস। একধরনের ...

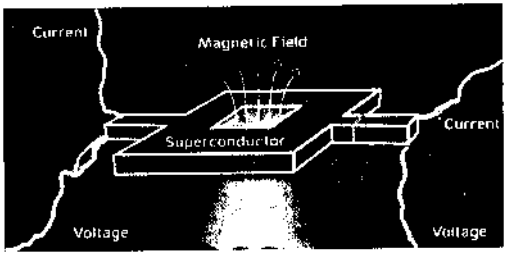

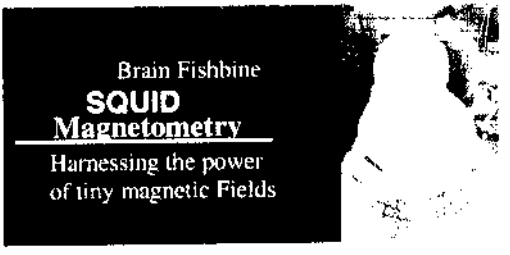

এতো গেল বড়ো বড়ো কাজের কথা। ছোট্ট ছোট কাজে কিছু করা যায় না? যায় ... একরকমের যন্ত্র রয়েছে একটা। নাম 'Squids' ; পুরোটা বললে দাঁড়ায় সুপারক... ইনটারফারেন্স ডিভাইসেস। একধরনের সংকেত নির্ণায়ক যন্ত্র। চৌম্বকক্ষেত্রের ... ঘটলে সেই পরিবর্তন পরিমাপ করা প্রায় দুঃসাধ্য। ফলে 'স্কুইডস' একটা বুদ্ধি করে ... পরিবর্তনটাকে ভিতরের পরিবর্তনে সামলে নেয়। আর বিভবের পরিবর্তন মাপতে ... লাগে না। কাজটা খুব সহজ হয়ে যায়। অতিপরিবাহিতা নিয়ে একুশ শতকের ... হবে একটা বড়ো মাপের উত্তর। Why are high temperature superconduct... conducting? আর কি জানতে হবে? আরও বেশি বেশি তাপমাত্রায় কাজ করে এমন ... করে জানিয়ে দিতে হবে। বড়ো গবেষণা, ছোট গবেষণা, পরিবহন ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ... অবহেলা করা যায় না। সবার সেরা মূলধনই বলা যায় বোধহয়। একদিন যদি কেউ ... আমার এই ছোট্ট 'স্কুইড' নিয়ে তুমি মস্তিষ্কের একটা 'অ্যাক্সিয়ন' বদলে বসিয়ে দাও, দেখো ... ভালোই কাজ করবে', বোধহয় এখন আর আমাদের কাছে একথা হেসে উড়িয়ে দেবার ...

প্রবন্ধকার : সিনিয়র সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, গ্রামীণফোন লিঃ, খুলনা।

পলিমারের রাসায়নিক ধারণা ও ইতিহাস

আহসান হাবিব

আধুনিক সভ্যতায় পলিমার বিজ্ঞানের আসন ব্যাপক। আর এর ব্যাপকতা এত বেশি যে, কোনো দিকে তাকালেই এক বা একাধিক পলিমার চোখে পড়ে। টুথ ব্রাশ থেকে বিমানের চাকা, বল পয়েন্ট থেকে সোফার আসন-এমনকি হাজারো ক্ষেত্রে রয়েছে পলিমারের ব্যবহার। প্রকৃতিতে রয়েছে বেশ কিছু দরকারি পলিমার। যেমন : চুল, রবার, সেলুলোজ (বৃক্ষ ও তুলা যার উৎস) ইত্যাদি। বর্তমানে বিল্ডিং ও গৃহস্থালির নানা জায়গায় পলিমার ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। সত্যি কথা বলতে কি- পলিমারের গুরুত্ব দিন দিন বেড়েই চলেছে।

পলিমারের ইতিহাস (History of Polymers) : প্রকৃতির সাথে পলিমারের সম্পর্ক কয়েক বিলিয়ন বছরের পুরোনো। এ কথা শুনলে সত্যিই অবাক হতে হয়। পৃথিবীর বিশাল ল্যাবরেটরিতে সেই ৪ বিলিয়ন বছর আগে যখন কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে জটিল অণু সৃষ্টির মাধ্যমে জীবনের সূত্রপাত ঘটলো তখনই এলো পলিমার, এলো প্রোটিন নাম নিয়ে। আর এগুলো সৃষ্টি হলো প্রকৃতিতে মিথেন, অ্যামোনিয়া ও কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি সরল অণু থেকে। এই যে প্রাণিকূল, তাদের দেহ তৈরি হলো ঐ অপরিহার্য প্রোটিন পলিমার দিয়ে।

প্রাচীনকাল থেকে মানুষ প্রাকৃতিক পলিমার যেমন কাঠ, তুলা, (সেলুলোজ) স্টার্চ প্রভৃতি খাদ্য, পোশাক ও আশ্রয়স্থলের জন্য ব্যবহার করে আসছে। বহু গাছ থেকে গাম ও রেজিন নিঃসৃত হয়। এরা পলিমার বস্তু এবং প্লাস্টিকের মতো আচরণ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে প্রাকৃতিক গাম ও রেজিন ছাঁচে ফেলে (moule) নানা প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং শেল্যাক (shellac) থেকে পালিশ তৈরি শুরু হয়।

রবার (Rubber) : রবার একটি প্রাকৃতিক পলিমার। পঞ্চদশ শতকে ক্রিস্টোফর কলম্বাস (Christopher Columbus) দেখলেন, দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা তাদের ভাষায় 'কাঁদুনে গাছের' (weeping wood) রস থেকে তৈরি কঠিন বস্তু দিয়ে লাফিয়ে ওঠা খেলা (bouncing game) খেলত। আর ঐ রবার নামটি দিলেন তার কয়েক বছর পর জোসেফ প্রিস্টলি (Joseph Priestly) কারণ কাগজের উপর পেন্সিলের দাগ তুলতে (rub off) এ বস্তু ব্যবহার করা যেত। পঞ্চদশ শতকে দক্ষিণ আমেরিকার আদিবাসীরা কি বুঝতে পেরেছিল কয়েক শতক পরেই কোটি কোটি ডলারের রবার শিল্প গড়ে উঠবে?

রবার একটি প্রাকৃতিক পলিমার

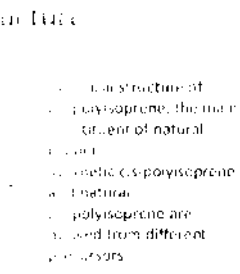

রবার এর রাসায়নিক গঠন

১৮২০ সালে থমাস হ্যানকক (Thomas Hancock) রবারকে এমনভাবে সংশোধন করেন যাতে চাপ প্রয়োগে তা থেকে নানা উপকরণ তৈরি করা যেতো। চার্লস গুডইয়ার (Charles Goodyear) রবারকে ভলকানাইজ (vulcanize) করার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ভলকানাইজেশন প্রক্রিয়ায় রবারের সাথে সালফার মিশিয়ে তাপ দেয়া হয়। প্রাকৃতিক রবার স্থিতিস্থাপক (elastic)। এ ভলকানাইজেশন প্রক্রিয়াই দ্রুত রবার শিল্পের বিকাশে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রথম সাংশ্লেষিক রবার শিল্পোৎপাদনের মাধ্যমে বাজারে আসে ১৯৩০ ও ১৯৩২ সালে যথাক্রমে থিওকল (thiokol) ও নিওপ্রিন (neoprene) নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৩৯-৪৫) বিভিন্ন ধরনের সাংশ্লেষিক রবার উৎপন্ন হয়। এরপর সেটিরিও স্পেসিফিক প্রভাবক ব্যবহার করে স্টেরিও রবার উৎপাদন শুরু হয়েছে।

প্লাস্টিক (Plastic) : ১৯৪৬ ক্রিশ্চিয়ান শনবেন (Christian Scoubein) একটি দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে সেলুলোজকে নাইট্রেশনের মাধ্যমে নাইট্রোসেলুলোজ তৈরির ধারণা লাভ করেন। সুইজারল্যান্ডের এ বিজ্ঞানী একদিন একটি বীকার ভেঙে ফেলেন; আর ঐ বীকারে ছিল নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রন। তিনি মেঝেতে ছড়িয়ে পড়া অ্যাসিড মিশ্রণ তার স্ত্রীর তুলাজাত সুতার তৈরি অ্যাপ্রোন দিয়ে মুছে তাড়াতাড়ি ধুয়ে আগুনের স্থানের কাছে শুকাতে দেন। তিনি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেন, অ্যাপ্রোনটিতে হঠাৎ আগুন লেগে তার ছাই বাতাসে মিলিয়ে গেল। তিনি ঘটনাটির মর্ম বুঝলেন এবং নিশ্চিতভাবে ধারণা করলেন যে, অ্যাপ্রোনটির বস্তু সেলুলোজ যা নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের মিশ্রণের সংস্পর্শে এসে নাইট্রোসেলুলোজে পরিণত হয়েছে। ঐ সময়ে তিনি নাইট্রোসেলুলোজ প্রস্তুত করেন।

Recycled Plastics

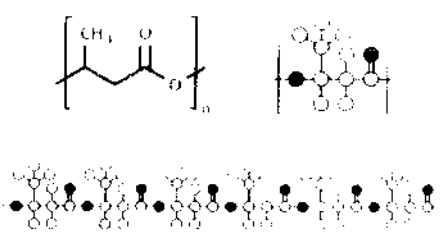

Polyhydroxybutyrate (PHB) plastics

পার্কস (Parkes) : দেখলেন যে, নাইট্রোসেলুলোজের প্লাস্টিক ধর্ম রয়েছে এবং শুকালে আয়তনে কমে আসে। তিনি গলিত ক্যাম্ফরে নাইট্রোসেলুলোজকে দ্রবীভূত করতে সক্ষম হন এবং মিশ্রণটিকে ছাঁচে ফেলে নানা উপকরণ তৈরি করেন। তিনি এর নাম দেন পারকেসাইন (parkesing) পরে আমেরিকাতে পার্কেসাইন প্লাস্টিকটির নাম হয় সেলুলোয়ডে (celluloid) এর পেছনে একটি ঘটনা আছে। তাহলো, ১৮৬৪ সালের দিকে U.S.A-তে হাতির দাঁত (ivory) থেকে প্রস্তুত বিলিয়ার্ড বলের চরম অভাব দেখা দিল। তদানীন্তন U.S.A সরকার হাতির দাঁতের বিলিয়ার্ড বলের বিকল্প উদ্ভাবনের

জন্য ১০,০০০ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেন। জে ডব্লু হায়াত (J.W. Hyatt) নাইট্রোসেলুলোজ ও ক্যাম্ফরের মিশ্রণ দ্বারা বিলিয়ার্ড বল তৈরি করেন এবং একে সেলুলয়েড নাম দেন এবং সরকার কর্তৃক ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেন। সেলুলয়েড খুবই দাহ্য এবং তা নাইট্রোসেলুলোজের মতোই। এ কারণে অন্যান্য প্লাস্টিক উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে।

প্রকৃতপক্ষে, বিশ শতকের ঘোড়ার দিক থেকেই প্লাস্টিক উৎপাদনের ব্যাপকতা দেখা যায় এবং এর উপর নানা শিল্প গড়ে উঠতে থাকে। অধিকাংশ প্লাস্টিকই এলোমেলো চেষ্টার (trial and error) মাধ্যমেই তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ধর্মের সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

রেজিন (Resins) : উনিশ শতকের কয়েকজন গবেষক বিশেষ কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্য নিয়ে কাজ করতে সমস্যায় পড়েন। তাঁরা দেখলেন, এসব দ্রব্যের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটালে খুবই আঠালো ও সান্দ্র (viscous) পদার্থ তৈরি হয় যা বিক্রিয়া পাত্রের গায়ে দৃঢ়ভাবে আটকে থাকে। উক্ত গবেষকদের একজন বেলজিয়াম রসায়নবিদ লিও ব্যাকেলান্ড (Leo Backeland) ১৯৯০ সালে অতি সাধারণ দুটি রাসায়নিক বস্তু ফেনল ও ফরমালডিহাইডের বিক্রিয়ার মাধ্যমে রেজিন-সদৃশ প্লাস্টিক প্রস্তুত করেন। তখন থেকেই পলিমার রসায়নের একটি নতুন মাত্রার দ্বারা উন্মোচিত হয়। ব্যাকেল্যান্ডের নামানুসারে এ রেজিনটির নাম রাখা হয় ব্যাকেলাইট (Bakelite)। একে ছাঁচে ঢেলে গলনের অযোগ্য (infusible) বিভিন্ন ব্যবহারের উপকরণ (যথা : বৈদ্যুতিক উপকরণ, টেলিফোন ইত্যাদি) তৈরি করা যায়। আধুনিক সাংশ্লেষিক পলিমারের পথিকৃত এ ব্যাকেলাইট। ১৯১২ সালে জ্যাকস ব্রান্ডেনবার্জার (Jacques Brandenburger) সেলোফেন (Cellophane) নামে বিখ্যাত এক স্বচ্ছ পদার্থ তৈরি করেন।

Clump of resin (frozen waterfall of hydrocarbons)

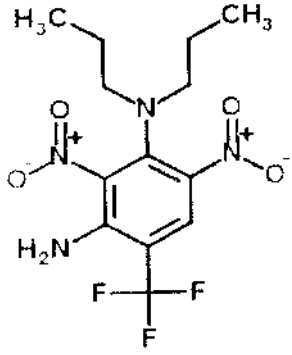

Marathon dental resin

অধিকাংশ সাংশ্লেষিক পলিমার তৈরি হয়েছে সাম্প্রতিক কয়েক দশকেই। আর তারা দখল করে নিয়েছে আধুনিক সভ্যতার অভাবনীয় এক বিরাট এলাকা। নয়নাভিরাম সাজসজ্জা উপকরণ, টেক্সটাইল, গৃহনির্মাণ সামগ্রী, প্যাকিং সামগ্রী, আরও কতকিছুর মধ্যে রয়েছে এসব সাংশ্লেষিক পলিমারের দৃপ্ত পদচারণা। সত্যি কথা বলতে কি আমরা এখন 'সাংশ্লেষিক পলিমারের যুগেই আছি'।

ডিকাইজ [illegible] ১৯৩৩ [illegible] আই সি আই (ICI) কোম্পানি পলিথিন আবিষ্কার করেন। [illegible] পলিট্রাফ্লোরোইথিলিন আবিষ্কার করেন প্লানেকেট (Plunnekett) আমেরিকান সায়ানামিড [illegible] ১৯৩৬ সালে মেলামাইন ফরমালডিহাইড প্রস্তুত করে। বিশ শতকের ত্রিশ দশকের [illegible] পলিউরেথেন [illegible] বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত হয়। ১৯৫৯ সালের দিকে ডিউ পন্ট [illegible] বাণিজ্যিকভাবে [illegible] প্রস্তুতির দিক নির্দেশনা দেন। বেয়ার ও জেনারেল ইলেকট্রিক [illegible] পলিকার্বনেট বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করে। সিলিকন পলিমারগুলো ১৯৩০ সালের দিকে [illegible] বাণিজ্যিক গুরুত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা যায়।

সাংশ্লেষিক সুতা (Synthetic fibre): [illegible] সালে অডেমারস (Audemars) প্রথম সাংশ্লেষিক সুতা তৈরি করেন। ইথার অ্যালকোহল মিশ্রণে সেলুলোজ নাইট্রেট দ্রবণ নিয়ে কাজ করার সময় তিনি এ সুতা তৈরি করতে সক্ষম হন। [illegible] সালে জে.ডব্লু.সোয়ান (J.W.Swan) 'সোয়ান সিল্ক' নামে সেলুলোজ নাইট্রেট [illegible] প্রস্তুত করেন। ১৮৮৪ সাল থেকেই সেলুলোজ নাইট্রেট থেকে কৃত্রিম সিল্ক উৎপাদন শুরু হয়। [illegible] বাজারজাত করেন চারডোনেট (Chardonet)।

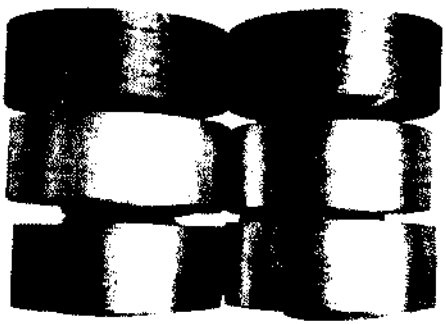

সাংশ্লেষিক সুতা Polyester

সাংশ্লেষিক সুতা Yarn

১৮৫৭ সালে শুইৎজার (Schweizer) [illegible] ও কপার হাইড্রক্সাইড দ্রবণে সেলুলোজ দ্রবীভূত করে [illegible] (Bemberg Rayon) নামে একটি কৃত্রিম সুতা তৈরি করেন।

১৮৯১ সালে একটি ব্রিটিশ রাসায়নিক কোম্পানি 'ভিসকোজ রেয়ন' (Viscose Rayon) আবিষ্কার করেন। [illegible] (pulp) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও কার্বন ডাইসালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে [illegible] জ্যানথেট তৈরি করেন। সেলুলোজ জ্যানথেটকে পুনরায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণে [illegible] রেয়ন প্রস্তুত করেন।

১৯৩৮ সালে নাইলন (Nylon) নামে পলিঅ্যামাইড সুতা আবিষ্কৃত হয়। ১৯৪১ সালে হুইনফিল্ড ও ডিকসন (Whinfield and Dickson) টেরিলিন নামে পলিএস্টার সুতা আবিষ্কার করেন (এটি রাসায়নিক ভাবে পলিইথিলিন টেরিথ্যালেট)।

[illegible] ১৯৩৩ সালে আই.সি.আই (ICI) কোম্পানি পলিথিন আবিষ্কার করেন [illegible] ফ্লোরোইথিলিন আবিষ্কার করেন প্লানেকেট (Plunnekett) আমেরিকান [illegible] সালে মেলামাইন-ফরমালডিহাইড প্রস্তুত করে। বিশ শতকের ত্রিশ দশকে [illegible] অ্যাসিটেট বাণিজ্যিকভাবে বাজারজাত হয়। ১৯৫৯ সালের দিকে [illegible] পলি-ইথার প্রস্তুতির দিক নির্দেশনা দেন। বেয়ার ও জেনারেল ইলেকট্রিক [illegible] কার্বোনেট বাণিজ্যিকভাবে তৈরি করে। সিলিকন পলিমারগুলো ১৯৩০ সালের [illegible] বাণিজ্যিক গুরুত্ব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর দেখা যায়।

সাংশ্লেষিক সুতা ([illegible] fibre) : ১৮৫৫ সালে অডেমারস (Audemars) প্রথম সাংশ্লেষিক সুতা তৈরি [illegible] অ্যালকোহল মিশ্রণে সেলুলোজ নাইট্রেট দ্রবণ নিয়ে কাজ করার সময় তিনি এ সুতা [illegible] ১৮৮৩ সালেও জে.ডব্লু.সোয়ান (J.W.Swan) 'সোয়ান সিল্ক' নামে সেলুলোজ [illegible] করেন। ১৮৮৪ সাল থেকেই সেলুলোজ নাইট্রেট থেকে কৃত্রিম সিল্ক উৎপাদন [illegible] করেন চারডোমেট (Chardomet)।

সাংশ্লেষিক সুতা **Polyester**

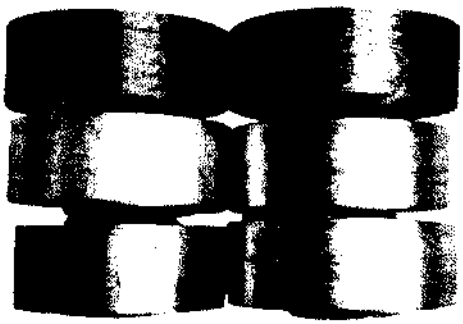

সাংশ্লেষিক সুতা Yarn

[illegible] (Schweizer) অ্যামোনিয়া যুক্ত কপার হাইড্রক্সাইড দ্রবণে সেলুলোজ দ্রবীভূত করে [illegible] (Bemberg Rayon) নামে একটি কৃত্রিম সুতা তৈরি করেন।

[illegible] রাসায়নিক কোম্পানি 'ভিসকোজ রেয়ন' (Viscose Rayon) আবিষ্কার করে [illegible] (pulp) সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড ও কার্বন ডাইসালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করিয়ে [illegible] জ্যানথেট তৈরি করেন। সেলুলোজ জ্যানথেটকে পুনরায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড [illegible] প্রস্তুত করেন।

[illegible] নামে পলিঅ্যামাইড সুতা আবিষ্কৃত হয়। ১৯৪১ সালে হুইনফিল্ড ও ডিকসন ([illegible] Dickson) টেরিলিন নামে পলিএস্টার সুতা আবিষ্কার করেন (এটি রাসায়নিক [illegible] টেরেফথালেট)।

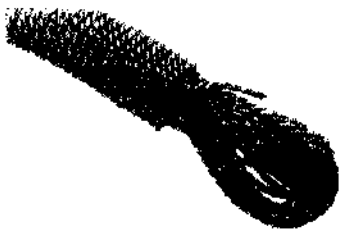

নাইলন কৃত্রিম সুতা

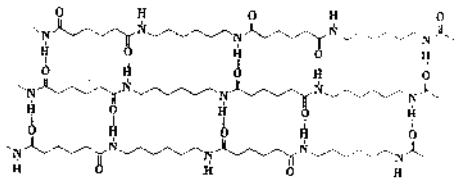

In nylon 6,6, the carbonyl oxygens and amide hydrogens can hydrogen bond with each other. This allows the chains to line up in an orderly fashion to form fibers.

নাইলন এর গঠন

১৯৫৯ সালে অরলন (Orlon) নামে যে কৃত্রিম সুতা বাজারে আসে তা ডিউ পন্ট ১৯৪৫ সালে অ্যাক্রোনাইট্রাইল থেকে তৈরি করেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই জার্মানিতে পলিভিনাইল ক্লোরাইড কৃত্রিম সুতা তৈরি করে। ডাউ কেমিক্যাল কোম্পানি ভিনাইলিডিন ও ভিনাইল ক্লোরাইড থেকে প্রাপ্ত সহপলিমারের কৃত্রিম সুতরা সারন (Saran) আবিষ্কার করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির (পলিইউরেথেন থেকে কৃত্রিম সুতা প্রস্তুত করে। বর্তমানে তা স্প্যানডেক্স (Spandex) নামে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আঠাজাতীয় পদার্থ (Adhesives) : প্রাণিজ আঠা বা গ্লু (glue) মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে ব্যবহার করে আসছে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে এর শিল্পোৎপাদন শুরু হয়। অধিকাংশ সাংশ্লেষিক রেজিন-টাইপ আঠা বিশ শতকেই তৈরি হয়েছে।

কৃত্রিম আঠাজাতীয় পদার্থ

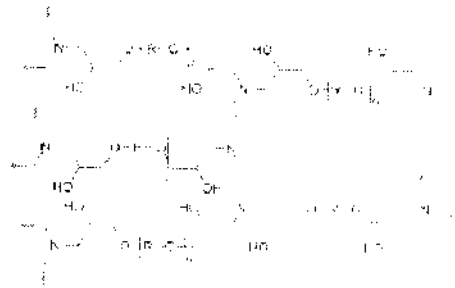

আঠাজাতীয় পদার্থ ইপক্সি এর গঠন

পলিমারের ইতিহাস থেকে দেখা যাচ্ছে, সাংশ্লেষিক পলিমার বেশ আগে থেকেই তৈরি ও ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তবে পলিমারের প্রকৃতি ও রসায়ন সম্পর্কে আধুনিক ধারণার বয়স খুব বেশি নয়, হবে ৫০-৬০ বছরে হবে। স্টডিংগার (Staudinger), ক্যারোথার্স (Carothers), মার্ক (Mark), ফ্লোরি (Flary), হাগিন্স (Hugging) প্রমুখ গবেষক পলিমারের প্রস্তুতি, প্রকৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে ব্যাপক ধারণার রূপকার।

প্রবন্ধকার : রিসার্চ অফিসার, হাউজিং এন্ড বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

নতুন আবিষ্কৃত ও উদ্‌ঘাটিত মহাকর্ষ-তরঙ্গ

আজিজুল আলম

অতি সাম্প্রতিক পদার্থবিজ্ঞানের বড় খবরটি হলো আইনস্টাইন ১০০ বছর আগে তাত্ত্বিকভাবে যে মহাকর্ষ-তরঙ্গ আবিষ্কার করেছিলেন তা বিজ্ঞানীদের হাতে সত্যি সত্যি ধরা পড়েছে। এর ফলে আইনস্টাইনের অতি গুরুত্বপূর্ণ আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বটি নতুন করে আরো শক্তভাবে হাতে-কলমে প্রমাণিত হলো। শুধু তাই নয়, মহাবিশ্বের সুদূর প্রদেশের খবর আমাদের কাছে আনতে আমরা একটি নতুন বার্তাবাহকের সন্ধান পেলাম। এতদিন আরো, রেডিও-তরঙ্গ এসবই ছিলো সেই বার্তাবাহক। এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হলো, আইনস্টাইন যে মহাকর্ষ তরঙ্গের কথা বলেছিলেন, সেটি আসলে কি? এটি এতদিন পর এখন বিজ্ঞানীদের হাতে কেমন করে ধরা পড়লো? সেই সম্পর্কে যথাসম্ভব সহজভাবে বোঝার চেষ্টা করবো।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বটি খুবই জটিল ও গাণিতিক একটি তত্ত্ব। তবে আমরা উপমার আশ্রয় নিয়ে এ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয় অংশটি সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা পেতে পারি।

মহাকর্ষের তত্ত্বটি প্রথম দিয়েছিলেন প্রায় ৩০০ বছর আগে নিউটন। নিউটনের তত্ত্বেভরযুক্ত সব বস্তু একে অন্যকে আকর্ষণ করে- সেটিই মহাকর্ষ। এটি এখনো চমৎকার ভাবে ফল দিলেও এর সূক্ষ্ম কিছু দূর্বলতার কারণে আইনস্টাইন মহাকর্ষের ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার সাধারণতত্ত্বে। এতে তিনি গাণিতিকভাবে দেখালেন ভরযুক্ত সব বস্তু তার চারপাশের স্থান-কালকে বিকৃত করে দেয়। ভর যত বেশী এই বিকৃতির পরিমাণ তত বেশি। স্থান-কাল জিনিসটিও আইনস্টাইনেরই নতুন দৃষ্টি ভঙ্গি। তিনি আগেই দেখিয়েছিলেন, যেইভাবে (স্পেস) ও কালকে (টাইম) আমরা আমাদের সব কিছুর আধার বলে ধরে করে আসছি তারা দুটি পৃথক সত্তা নয় একই সত্তার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রা (ডাইমেনশন)- সেই একীভূত সত্তাকে বলা হলো স্থান-কাল (স্পেস-টাইম)। ভরযুক্ত বস্তু চারিদিকে স্থান-কালকে যেভাবে বিকৃত করে তার পূর্ণ জ্যামিতিক রূপ আইনস্টাইন তার সমীকরণে ধরতে পেরেছিলেন। আমরা শুধু একটি উপমার মাধ্যমে এটি দেখতে পারি। শিশুপার্কে বা বাড়িতে আমরা ট্রাম্পোলিন নামে একটি খেলার জিনিস দেখি যার ওপর খুব ছোট শিশুরা লাফালাফি করার জন্য রাবার বা এমন কিছুর চাদরকে টান টান করে মেলে রাখা হয়। তার মাঝখানে যদি একটি ছোট শিশুকে বসিয়ে দিই তাহলে চাদরটি সেখানে আর সমতল থাকবে না, কিছুটা বিকৃত হয়ে পড়বে। উপমাটিতে শিশুটি ভরযুক্ত কিছুর এবং চাদরটি স্থান-কালের প্রতিনিধিত্ব করছে। এই অবস্থায়ওই চাদরের কোথাও একটি টেনিস বল রাখলে ওটি বিকৃত চাদরের কারণে গড়িয়ে শিশুটির দিকেই যাবে। আমাদের তখন মনে হবে একটি ভর (শিশু) অন্য ভরকে টেনিস বল আকর্ষণ করছে। এভাবেই যে মহাকর্ষ নিউটনের কাছে ভরের আকর্ষণ ছিলো আইনস্টাইনের কাছে তা হয়ে পড়লো ভরের কারণে বিকৃত

স্থান কালের ফল। উপমাটি যদি আমরা চালিয়ে যাই এবং শিশুটিকে যখন চাদরের মাঝখানের ওপর লাফালাফি শুরু করতে বলি তাহলে চাদরটির বিকৃতি হয়ে নিয়মিত হারে কাঁপাকাঁপিতে পরিণত হবে। এই চাদরটি যদি অনেক অনেক বড়ও হয় এই কাঁপুনির একটি তরঙ্গ চাদর বেয়ে তার কেন্দ্র থেকে কিনারার দিকে ছড়িয়ে পড়বে। অবশ্য যত দূরে যাবে তত দূর্বল হয়ে পড়বে। বিকৃতির চেহারাটি এক্ষেত্রে জটিলতর হলেও আইনস্টাইন তার জটিল গাণিতিক সমীকরণে তা ঠিক ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। ওই সমীকরণের সমাধান থেকে এও তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যে স্থান-কালের কোথাও ভরযুক্ত বস্তুর কাঁপুনির ফলে স্থান-কালের মধ্যে একটি তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে যাবে যা এর প্রত্যেক বিন্দু দিয়ে যাওয়ার সময় সেখানকার স্থানকে তরঙ্গাকারে বিকৃত করতে করতে যাবে। এটিই আইনস্টাইনের তত্ত্বের মহাকর্ষ তরঙ্গ।

উদাহরণস্বরূপ, তরঙ্গ যেখান দিয়ে যাবে সেখানে কোন নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যায়ক্রমে ওই তরঙ্গের ভঙ্গিতে ছোট-বড় হতে থাকবে। সেখানে এ রকম দূরত্বের বাড়া-কমা ধরতে পারার মাধ্যমে মহাকর্ষ তরঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। আর ঠিক সেভাবেই শেষ পর্যন্ত এটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বস্তুর ওই ভর যদি অত্যন্ত বেশি হয় এবং তা যদি দারুণভাবে তোলপাড় করে কাঁপে তাহলে স্থান কাল বেয়ে আসা সে তরঙ্গ অনেক দূরে গিয়েও অনুভূত হবে। যদিওবা তার সেখানে যেতে শত কোটি বছরও লেগে যায়। মহাবিশ্বের সুদূর প্রদেশে সৃষ্টি হওয়া এমনি তরঙ্গ পৃথিবীতে আসতে আসতে এত দূর্বল হয়ে যায় যে, আইনস্টাইনের কালে অথবা তার শতবছর পরেও এমন সংবেদনশীল কোনো উপায় ছিলো না যার মাধ্যমে সেই তরঙ্গ উদ্‌ঘাটন করা যায়। তাই এটি শুধু তত্ত্ব হয়েই ছিলো, প্রমাণিত হতে পারেনি।

অবশ্য ১৯৭৪ সালে রাসেল হালস এবং জোসেফ টেইলর এই দুজন বিজ্ঞানী পরোক্ষভাবে মহাকর্ষ তরঙ্গের এক রকম প্রমাণ দিয়েছিলেন। তারা দেখলেন যে ২১ হাজার আলোকবর্ষ দূরের (যার থেকে আলো আসতে ২১ হাজার বছর লাগে) দুটি খুবই ভারী তারা একে অপরের চারিদিকে ঘুরছে। কিছু বড় তারা শক্তি উৎপাদনের বয়স শেষ করে বৃদ্ধ হলে নিজের ওপর নিজে এমনভাবে ধসে পড়ে যে, তার পরমাণুগুলো পর্যন্ত আর টেকে না। তখন সেগুলো শুধু নিউট্রনে গড়া অতি ঘনভরের ছোট নিউট্রন তারায় পরিণত হয়ে যায়। হালস ও টেইলর এদের ঘোরার আচরণ থেকে হিসাব করে দেখিয়েছিলেন যে, এরা একটি বিশেষহারে শক্তি হারিয়ে পরস্পরের কাছে চলে আসছে। এই হারানো শক্তিটি যেভাবে বিকীর্ণ হচ্ছে বলে বোঝা যাচ্ছিল তার হিসাবটি আইনস্টাইনের সমীকরণ বর্ণিত মহাকর্ষ তরঙ্গের সঙ্গে হুবহু মিলে গিয়েছিলো। পরোক্ষভাবে মহাকর্ষ তরঙ্গপ্রমাণের জন্য ওই বিজ্ঞানী দুজন ১৯৯৩ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু এবার যে সাফল্য এসেছে সেটি পরোক্ষ প্রমাণ নয়-একেবারেই হাতেকলমে প্রমাণ। এটি অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীর কয়েক দশকের বেশী সময় ধরে

সম্মিলিত গবেষণার [illegible] ফলেই সম্ভব হয়েছে। এতে যুক্তরাষ্ট্র ও আরো ১৪টি দেশের মোট এক হাজারের বেশি বিজ্ঞানী [illegible] করেছেন বটে কিন্তু এ গবেষণার প্রাণ হলো লিগো নামের দুটি যন্ত্র। যার একটি রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের [illegible] দক্ষিণের একটি রাজ্য লুজিয়ানার লিভিং স্টোনে। আর অন্যটি রয়েছে উত্তরের একটি রাজ্য ওয়াশিংটনের হ্যান ফোর্ডে। এই যন্ত্র দুটিতেই একেবারে হাতে নাতে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়েছে অতি [illegible] পৃথিবী দিয়ে যাওয়া মহাকর্ষ তরঙ্গ-এতই সংবেদনশীল এই যন্ত্র। দেখা গেছে মহাকর্ষ তরঙ্গটির উৎস হলো পৃথিবী থেকে ১০০ কোটি আলোকবর্ষের বেশি দূরে, যার মানে সেখান থেকে আলো আসতেই ১০০ কোটি বছরের ওপর লেগে যায়। এত দূর থেকে আসার কারণেই মহাকর্ষ-তরঙ্গ এখানে অতি দূর্বল। এটি স্থানীয় স্থান-কালকে যেটুকু কাঁপিয়ে যায় উদ্‌ঘাটন করার জন্য তা খুবই অপ্রতুল। কিন্তু লিগো যন্ত্রটি তাই করতে পেরেছে।

লিগো নামটি আদ্যক্ষরে গঠিত- পুরো কথাটি হলো "লেজার ইন্টারফেরোমিটার গ্র্যাভিট্যাশন্যাল ওয়েভ অবজারভেটরি"। এতে ইংরেজি L অক্ষরের মতো সাজানো দুটি বাহুর প্রত্যেকটি চার কিলোমিটার দীর্ঘ। প্রত্যেক বাহুর দুটি প্রান্তে রয়েছে পরস্পর মুখোমুখি আয়না যার মধ্যে একটি লেজার আলোর রশ্মি বার বার প্রতিফলিত হয়ে আসা-যাওয়া করে। দুই বাহুতে আলোর দুটি রশ্মি এভাবে এসে এক জায়গায় পরস্পরের উপর উপরিপাতিত হলে দুটির আলোক তরঙ্গের একের শীর্ষবিন্দু যেখানে অন্যটির শীর্ষবিন্দুর ওপর পড়ে সেখানে উভয়ে একত্রিত হয়ে জোরালো আলো দেয়, আর যেখানে একের শীর্ষবিন্দু অন্যটির পাদ বিন্দুর ওপর পড়ে সেখানে একটি অন্যটিকে নষ্ট করে অন্ধকার সৃষ্টি করে। এ ব্যাপারটিকে বলা হয় আলোর ইন্টারফেরেন্স। অদ্ভুতরকম অধিক সংবেদনশীলতাই অবশ্য লিগোর ইন্টারফেরোমেট্রির নতুনত্ব। হিসাবে দেখা যায় যদি মহাকর্ষ তরঙ্গ ওখান দিয়ে যায় তাহলে L-এর বাহুর দৈর্ঘ্য হেরফের ঘটার পরিমাণ ১০-১৮ মিটার। অর্থাৎ একের পিঠে ১৮টি শূন্য দিলে যে বিশাল সংখ্যা হয় তত ভাগের এক মিটার। কম্পিউটার মডেল থেকে আমরা জেনেছি যে, পৃথিবী থেকে ১.৩ শত কোটি আলোকবর্ষ দূরে অতি ঘনভরের কারণে ব্ল্যাক হোলে পরিণত হওয়া প্রত্যেকটি ৩০টি সূর্যের সমান ভরের দুটি তারা ক্রমাগত পরস্পরকে আবর্তনকরতে করতে পরস্পরের কাছে থেকে শক্তি বিকিরণ করেছে। মহাবিশ্বের ইতিহাসে আদিতে এক সময় এটি ঘটেছিলো। শেষ পর্যন্ত উভয়ে খুবই কাছে এসে আলোর গতির প্রায় অর্ধেক গতিতে পরস্পরকে আবর্তন করেছে এবং একসঙ্গে মিশে গিয়ে দুটির বদলে একটি ব্ল্যাকহোল হয়েছে। সেই বিশেষ সময়েই মিলিত ব্ল্যাক হোলের ভরের বড় অংশ $E=mc^2$ ফরমূলা অনুযায়ী শক্তিতে পরিণত হয়ে সেই প্রচণ্ড তোলপাড়টির সৃষ্টি করেছিলো। এরই সৃষ্ট তরঙ্গ শতকোটি আলোকবর্ষ দূর এসে এত দূর্বল হয়েছে যে এখানকার লিগো যন্ত্রটি অতিক্রম করার সময় স্থানের ওইটুকু অতি সামান্য বিকৃতি ঘটিয়ে যাচ্ছে। তোলপাড়ের ওই শব্দটিতে যেন আমরা মহাবিশ্বে সুদূরে ব্ল্যাক হোল দুটির এক হওয়ার

এই প্রচণ্ড তোলপাড়ের আভাসটিই শুনতে পাচ্ছি এত দূর থেকে। তোলপাড়টি এত প্রচণ্ড না হলে হয়তো লিগোর বর্তমান সংবেদনশীল হতে হতো।

তবে একবার যখন মহাকর্ষ তরঙ্গ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এখন আমরা আশা করতে পারিযে, সংবেদনশীলতা বাড়িয়ে এই মহাকর্ষ তরঙ্গের মাধ্যমে এখন থেকে মহাবিশ্বের ছোট বড় বহু ঘটনার খবর আমরা পাব, যা এতদিন মহাবিশ্ব থেকে আসা আলোক তরঙ্গের মাধ্যমে পাচ্ছিলাম না। রেডিও তরঙ্গ, এক্সরে-তরঙ্গ ইত্যাদির মাধ্যমেও পাচ্ছিলাম না। কিন্তু নতুন আবিষ্কৃত ও উদ্‌ঘাটিত মহাকর্ষ তরঙ্গ সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির একটি নতুন তরঙ্গ। এর উদ্‌ঘাটনে মহাবিশ্ব সংক্রান্ত বিজ্ঞান একটি সম্পূর্ণ নতুন মাত্রা পেল। সেই সঙ্গে এটি ১০০ বছর আগে তাত্ত্বিকভাবে ভবিষ্যদ্বানী করা এই তরঙ্গ হাতেনাতে ধরতে পেরে তাত্ত্বিক পদার্থ বিদ্যার শক্তি আবারও প্রমাণ করলো।

এ জন্যই একে আমাদের কালের একটি অন্যতম প্রধান আবিষ্কার বলা হচ্ছে।

তথ্যপুঞ্জি:

১. দৈনিক পত্রিকা: বাংলাদেশ প্রতিদিন- মুহম্মদ ইব্রাহীম।

২. মাধ্যমিক পদার্থ বিজ্ঞান: আলী আসগর সম্পাদিত।

৩. বিজ্ঞান সমগ্র-এ.এম. হারুন অর রশীদ।

৪. আরো একটুখানি বিজ্ঞান-মুহম্মদ জাফর ইকবার।

প্রবন্ধকার: অর্থনীতি বিভাগ (৩য় বর্ষ) ছাত্র, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

"পরমাণুর ওই সুপ্ত শিকড়ে, জগৎচক্র আজি জাগিয়া শিখরে"

মোঃ রিদওয়ানুর রহমান

'পরমাণু' শব্দটি কোনো শিক্ষিত মানুষ শোনেনি, যা আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়। আমরা প্রায়ই শুনে থাকি বহুল আলোচিত পারমাণবিক বোমার কথা যা তৈরিই হয় পরমাণু দ্বারা। যেটা নিমিষেই ধ্বংস করে দিতে পারে আমাদের এই প্রিয় পৃথিবী নামক ভূখণ্ডের একটি বিশাল অঞ্চল। যে কারণে, অনেকেই পারমাণবিক বোমা আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানের এই অবিরত অগ্রযাত্রাকে দায়ী করে থাকেন। আবার সেই একই পারমাণবিক তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর মানুষের দৈনন্দিন জ্বালানির চাহিদা মেটানো হচ্ছে, ক্যানসারের চিকিৎসা হচ্ছে, কৃষি উন্নয়নে ব্যবহৃত হচ্ছে। এছাড়া, আরও কত দৈনন্দিন কাজে পরমাণুকে ব্যবহার করা হচ্ছে যা বলে শেষ করা কঠিন। যাই হোক, আমার এই প্রবন্ধটি পরমাণুর বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যবহার নিয়ে আদৌ নয়। বরং, আমার এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, পৌরাণিক সময়ে লিখিত বিভিন্ন মননের মাঝে রহস্যাবৃত বিবিধ সুপ্ত জ্ঞানের আলোকে পরমাণুর এবং উৎস অন্বেষণ করা।

বিশ্বসংসারে সকল প্রকার পদার্থ যেমন অজৈব ও জৈব অথবা জীবন্ত বস্তু সকল কিছুই গঠিত হয় নানা রকমের এবং বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরমাণু দিয়ে। বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯৮ প্রকারের প্রাকৃতিক পরমাণু আবিষ্কার করেছেন। খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর গ্রিক পরমাণুবাদীগণ মানবদেহকে পরমাণুর তৈরি বলে মনে করতেন। তারা আরও মনে করতেন কর্কশ ও মসৃণ এই দুই ধরণের পরমাণুর সংযোগ এবং বিয়োগের ফলে একটি মানবদেহ সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, আধুনিক বিজ্ঞানের মতবাদ অনুসারে, একটি জৈবিক বস্তু হিসেবে মানবদেহ ৯৮টি মৌল দ্বারা সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে, সেই সকল মৌলগুলির মাঝে কোথাও কম, কোথাও বেশি, এ ধরনের তারতম্য ঘটিয়ে সৃষ্টি হয় একটি জীবন্ত মানবদেহ।

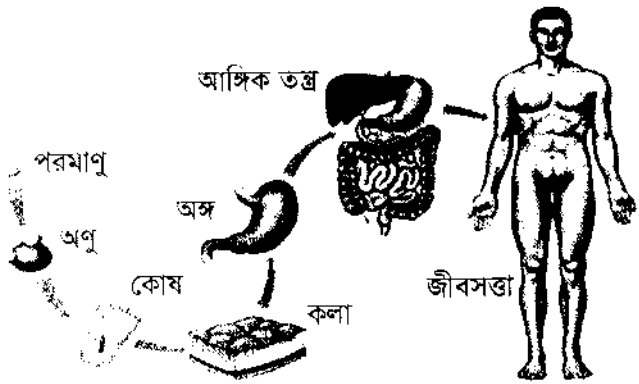

পরমাণু হতে সৃষ্ট একটি জীবন্ত মানবদেহ

এখন, কয়েক হাজার বছর পেছনে গিয়ে সেই সময়ের বিশ্বজগৎ সৃষ্টি সম্পর্কিত পুরাণের দিকে লক্ষ্য করা যাক। তবে, সবার আগে আমাদের জানতে হবে 'পুরাণ' আসলে কী? 'পুরাণ' হচ্ছে প্রাচীনকাল থেকে পুরুষানুক্রমে প্রবাহমান কাহিনী যা বিশেষত কোনো জাতির আদি ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্বাস, ধারণা ও নৈসর্গিক ঘটনাবলির ব্যাখ্যা। কার্যত, ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে পুরাণ হচ্ছে অতীতের বিশেষ সংস্করণ যা ব্যাখ্যা করে বর্তমানকে। কোনো সন্দেহ নেই, পুরাণের

রয়েছে অফুরন্ত শক্তি। কেননা, কালের বিবর্তনে পুরাণসমূহ খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং নতুন রূপ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে পৃথিবীর প্রাচীন একটি সভ্যতা হল চীনা সভ্যতা। যাদের রয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের লিখিত ইতিহাস। বিশ্বজগৎ সৃষ্টির বিষয়টি নিয়ে তাদের মাঝেও গড়ে উঠেছিল বিভিন্ন পুরাণভিত্তিক কাহিনী ও দর্শনশীলক চিন্তন হিসেবে। এবার মূল বিষয়ে আসা যাক, 'পরমাণু' নামক শব্দটির পুরাণভিত্তিক উৎস অনুসন্ধান করতে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রথমে প্রাচীন চৈনিক পুরাণে দৃষ্টিপাত করেছি। কারণ খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের দিকে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম খাঁটি বিজ্ঞানসম্মত জ্যোতির্বিদ্যা অনুশীলন শুরু হয়েছিল প্রাচীন চীনে। আন্না বিরেল নামক একজন বিজ্ঞ পণ্ডিত ওনার "চৈনিক পুরাণ" নামক প্রবন্ধে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পৌরাণিক বিবরণ হিসেবে উল্লেখ করেন:

"... 'জগৎ সৃষ্টির পূর্বে ছিল বাষ্পের এক অবয়বহীন বিস্তার' ....

'কালের সূত্রপাতে সব পদার্থ ছিল একটি মুরগির ডিমের মতো'..."।

বস্তুত, প্রাচীন চৈনিক পুরাণে 'জগত সৃষ্টির পূর্বে ছিল বাষ্পের এক অবয়বহীন বিস্তার' কথাটি ইঙ্গিত করে বিশ্বজগতে ছায়াপথ গঠিত হওয়ার পূর্বে সৌর বস্তুগুলো বাষ্পীয় আকারে বিদ্যমান ছিল। অর্থাৎ ছায়াপথগুলো গঠনের পূর্বে ব্যাপক গ্যাসীয় বস্তু বা মেঘমালা সেখানে বিদ্যমান ছিল। অতএব, আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের তথ্য অনুসারে আমরা জানি মহাকাশের ধোঁয়াকুণ্ড থেকে আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, মহাকাশের ছায়াপথ সম্পর্কে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ডেমোক্রিটাসের ধারণা ছিল বেশ উন্নত। তিনি বলতেন, অসংখ্য নক্ষত্র একসাথে সমাবেশের ফলেই ছায়াপথের আলো দেখা যায়। পক্ষান্তরে, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, মহাশূন্যে অন্ধকার আকাশে দীপ্তিমান পথের মতো নক্ষত্রজগতের যে অংশ দেখা যায় তাই ছায়াপথ। অন্যভাবে বলতে গেলে, মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে দল সৃষ্টি হয়েছে, তাকে নক্ষত্রজগৎ বলে। মহাকাশে অসংখ্য নক্ষত্রজগৎ রয়েছে। একটি নক্ষত্রজগতের ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বলে। সে যাই হোক না কেন, প্রাচীন চৈনিক পুরাণে 'কালের সূত্রপাতে সব পদার্থ ছিল একটি মুরগির ডিমের মতো' কথাটি নির্দেশ করে বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পূর্বে সমস্ত কিছু শুধু একক বিন্দুতে পুঞ্জীভূত ছিল যাকে পরোক্ষভাবে অতি-পরমাণু হিসেবে একটি পৌরাণিক মুরগির ডিমের সাথে তুলনা করা যেতেই পারে। কেননা, বিশ্বজগতের সমস্ত বস্তু শুধুই একটি মাত্র উৎস থেকে এসেছে। কার্যত, সমস্ত পদার্থের প্রাথমিক উৎস একটাই, সেটা হল নিঃসন্দেহে অতি-পরমাণু।

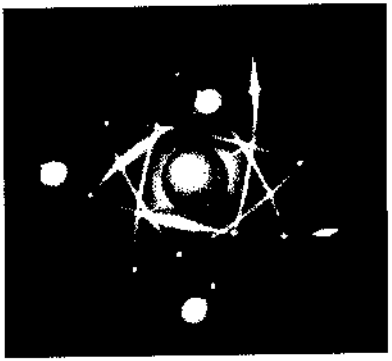

পরমাণু দ্বারা সমগ্র জগৎ সৃষ্টির একটি প্রকল্পিত নমুনা

ছিল এবং শুরুতে একটি বিশাল বিস্ফোরণ ঘটেছিল। এরকম ধারণার ব্যাখ্যা গ্রীক দার্শনিক এম্পিডক্লিস (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৯০–৪৩০ অব্দ) ওনার "On Nature" গ্রন্থে। প্রকৃতপক্ষে, আজকের সময়ে ওনার এই অসাধারণ মতবাদটি পৌরাণিক নামে বহুল পরিচিত। ওনার মতে, মহাজগতের সকল উপাদান একসময় একটি বিষ্ট ছিল। তারপর, উপাদনসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি ঘূর্ণি থেকে অনবরত যেতে যেতে মহাবিশ্বের বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। অধিকন্তু, আরেকজন নিক অ্যানাক্সেগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০–৪২৮ অব্দ) মনে করেন, জগতের আদি প্রকৃতপক্ষে "বীজ উপাদান"। তিনি আরও মনে করেন, জগৎ সৃষ্টির প্রথমে উপাদান একত্রে জড়িত হয়ে একটি পিণ্ড আকারে ছিল। এই পিণ্ডের মধ্যে বীজ উপাদান একটি বিশৃঙ্খল অবস্থায় ছিল। কিন্তু কোনো এক অজ্ঞাত সময়ে বিচ্ছিন্নতা। পিণ্ড ভেঙ্গে বিভিন্ন প্রকার বীজ আলাদা হয়ে যেতে থাকে। এভাবে আরম্ভ হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে, অ্যানাক্সেগোরাসের এরূপ মতবাদটি বাদীদের মতবাদের সাথে দুটি দিক থেকে গভীরভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রথমত, তিনি উপাদান অসংখ্য হওয়া দরকার এবং দ্বিতীয়ত সেই উপাদান হচ্ছে জড়কণা।

এই আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও বিগব্যাং তত্ত্ব হিসেবে আমরা জানি একসময় ও অন্যান্য গ্রহের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। এই অস্তিত্বহীন অবস্থার মাঝে ছোট বিন্দু। এই ছোট বিন্দুর মাঝে সবকিছু ছিল ঘনসন্নিবিষ্ট। আজ থেকে কোটি বৎসর পূর্বে এই ছোট বিন্দুটি প্রচণ্ড বেগে বিস্ফোরিত হল। সমস্ত বস্তু বিষ্ট ছিল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। এরপর, খণ্ড খণ্ড ছড়িয়ে পড়া যুক্ত হয়ে তৈরি করল পরমাণু। এই পরমাণু থেকে ধীরে ধীরে তৈরি হল গ্রহ, নক্ষত্রসমূহ এবং ছায়াপথ। বেলজিয়ামের জ্যোতির্বিজ্ঞানী জি. লেমেইটার বিগব্যাং তত্ত্বের প্রবক্তা।

বিগব্যাং বা বৃহৎ বিস্ফোরণের মাধ্যমে বিশ্বজগৎ সৃষ্টি

হকিং ওনার A Brief History of Time নামক বিখ্যাত বইতে বিগব্যাং কোয়ান্টাম তত্ত্ব অনুযায়ী, হকিং-এর সেই ব্যাখ্যার সারমর্ম ছিল: মহাবিশ্ব বা পরমাণু দ্বারা গঠিত। হকিং-এর উপস্থাপিত কোয়ান্টাম তত্ত্ব-এর উপর বোস ভগবত (৩/১১/১-২)-এর শ্লোকসমষ্টির আলোকে সুসম্বদ্ধ তত্ত্ব চেষ্টা করেন তা নিচে সংক্ষেপে প্রদত্ত হলো–

ক্ষুদ্রতম অংশ অবিভেজ্য এবং দেহরূপে যার গঠন হয় না, তাকে বলা হয় পরমাণু। অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান থাকে .... পরমাণুর দ্বারা গোটা জগৎ সৃষ্টি হয়।"

উপরের উদ্বৃত্তি ইঙ্গিত দিচ্ছে যে পরমাণু অবিভাজ্য। আমরা সকলেই জানি যে, 'পরমাণু' শব্দটিকে ইংরেজিতে atom বলা হয়। এই শব্দটি গ্রিক শব্দ atomos থেকে এসেছে। গ্রিক শব্দসংস্থানবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী a অর্থ 'না' এবং tomos অর্থ 'ভাগ করা'। সুতরাং, atomos শব্দের অর্থ হলো 'অবিভাজ্য' অথবা যা ভাগ করা যায় না। তথাপি, ভারতীয় ঋষি ও দার্শনিক কণাদ যীশু খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৬০০ বছর পূর্বে পরমাণু সম্পর্কে ধারণা দিয়েছিলেন। ওনার মতে, সকল পদার্থই ক্ষুদ্র এবং অবিভাজ্য কণিকা দ্বারা তৈরি। এছাড়া, খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে দার্শনিক লিউসিপাস এবং দার্শনিক ডেমোক্রিটাস হচ্ছেন প্রাচীন গ্রিক পরমাণুবাদের প্রকৃত সূচনাকারী। ওনাদের দর্শনগুলি আলাদা করে আলোচনা করা কঠিন। এ পর্যন্ত চলে আসা ভাষ্যকার বা আলোচকগণ প্রায় সকলেই ওনাদেরকে একসাথে উল্লেখ করে আসছেন। তবে অনেকের মতে, এ ক্ষেত্রে লিউসিপাসের মৌলিকত্য বেশি। প্রকৃতপক্ষে, ওনার চিন্তনকেই ডেমোক্রিটাস প্রসারিত করে প্রচার করেছেন। কেননা, ডেমোক্রিটাস ছিলেন লিউসিপাসের সুযোগ্য শিষ্য। ওনারা দুজনেই মনে করেন, সকল পার্থিব বস্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবিভাজ্য কণার দ্বারা গঠিত। পরবর্তীতে, ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন ডাল্টন ১৮০৩ সালে এ মতবাদকে বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। ডাল্টনও বিশ্বাস করতেন, পরমাণু অবিভাজ্য।

অবিসংবাদিতরূপে, আধুনিক রসায়নের ভিত্তি হচ্ছে পরমাণুবাদ। এ কারণে জন ডাল্টনকে আধুনিক রসায়নের জনক বলা হয়। যাই হোক, আধুনিক রসায়নের ভিত্তি বলে পরিচিত ডাল্টনের পরমাণুবাদে পরমাণুকে অবিভাজ্য ধরা হয়েছে। কিন্তু ওনার এই তত্ত্ব বর্তমানে একেবারেই অচল। কেননা, পরবর্তী বিজ্ঞানীরা পরমাণুকে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন। অতএব, পরমাণু আদপেই অবিভাজ্য নয়। ১৮৯৭ সালে স্যার জে. জে. থমসন সর্বপ্রথম পরমাণুর ক্ষুদ্রতম কণিকা হিসেবে 'ইলেকট্রন' আবিষ্কার করেন। তারপর, ১৯১১ সালে বিজ্ঞানী আর্নেস্ট রাদারফোর্ড এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক আধানযুক্ত অত্যন্ত ভারী একটি মূল বস্তু আছে, যেটাকে পরবর্তীতে 'নিউক্লিয়াস' নামকরণ করা হয়। এরপর, ১৯১৯ সালে রাদারফোর্ড পরমাণুর 'প্রোটন' আবিষ্কার করেন। সবশেষে, বিজ্ঞানী জেমস চ্যাডউইক পরমাণুর 'নিউট্রন' আবিষ্কার করেন ১৯৩২ সালে।

BANSDOC Library
Dhaka

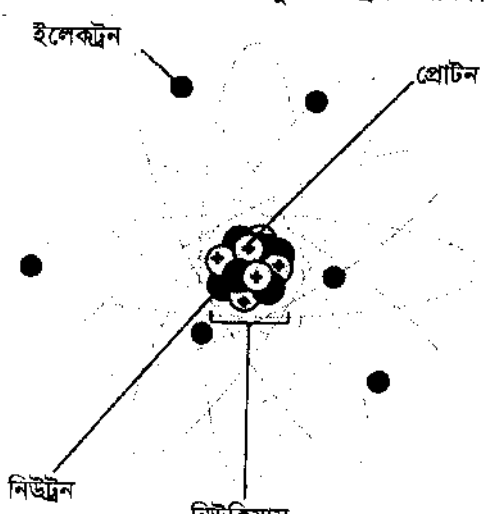

বিভাজ্য পরমাণুর প্রকৃত গঠন

বর্তমানে এটা অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণিত যে, পরমাণু আদপেই অবিভাজ্য নয় বরং বিভাজ্য। একটি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে নিউট্রন ও প্রোটন কণাযুক্ত নিউক্লিয়াস এবং তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রন কণা। যেমন, ইট সাজিয়ে দালান তৈরি করা হয়, তেমনি এই সকল পরমাণু দিয়ে সমস্ত বস্তু তৈরি। একটি বস্তু থেকে আরেকটি বস্তুর পার্থক্য তৈরি হয় পরমাণু কেন্দ্রের নিউক্লিয়াসের নিউট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা এবং তার চতুর্দিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের সংখ্যার তারতম্যের জন্য। এর ফলে, পরমাণুসমূহের চমৎকার এক সজ্জা বা বিন্যাস এবং শৃঙ্খলা রয়েছে।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, বিশ্বের একজন কিংবদন্তী মুসলিম পণ্ডিত আল-বেরুনী (৯৭৩–১০৪৮ খ্রিষ্টাব্দ) গজনীর দিগ্বীজয়ী সুলতান মাহমুদের একান্ত সঙ্গী হিসেবে বেশ কয়েকবার ভারতে এসেছিলেন। তিনি তৎকালীন ভারতীয় শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার দেখে খুবই বিস্মিত হন। যার ফলে, তিনি ১০১৯ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১০২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবস্থান করে সেখানকার বিভিন্ন জ্ঞান বিজ্ঞানের বই অধ্যয়ন করেন। এরপরে, ভারত থেকে ফিরেই তিনি কিতাবুল হিন্দ নামক ওনার বিশ্বখ্যাত বই রচনা করেন। ওনার সেই বইতে, সেই সময়ের ভারতীয় পণ্ডিতদের 'আকাশ' সম্পর্কিত মতবাদ হিসেবে উল্লেখ করেন।

"... আকাশের 'গন্ধ', 'রস', 'রং' এবং 'ছোঁওয়া যায়' এমন কোনো গুণ নেই, কেবল শব্দ আছে। আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করে হিন্দুরা কী বোঝাতে চায় আমি জানি না..."

আল-বেরুনীর কিতাবুল হিন্দ থেকে নেওয়া উদ্বৃতি থেকে ধারণা করা যেতেই পারে তৎকালীন ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতগণও হয়ত বিশ্বাস করতেন যে, আকাশের আদৌ নিজস্ব কোনো রং নেই। কেননা, আকাশ হল পৃথিবীর অসীম শূন্যতা। যদিও পৃথিবী থেকে আকাশের রং নীল দেখায় যার কারণ হিসেবে আধুনিক বিজ্ঞানীরা ব্যাখ্যা করেন: "যখন কোনো আলোক তরঙ্গ কোনো ক্ষুদ্র কণিকার উপর পড়ে, তখন কণিকাগুলো আলোক তরঙ্গকে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে দেয়। একে বলা হয় আলোর বিক্ষেপণ। যে আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য যত কম হবে তার বিক্ষেপণ তত বেশি হবে। সুতরাং, নীল আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সবচেয়ে কম বলে, সূর্যরশ্মির নীল আলো বায়ুর অণু দ্বারা বেশি বিক্ষেপণ হয়। যার ফলে, আমাদের দৃষ্টিতে আকাশকে সর্বদা নীল দেখায়"। এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক, সকল ভারতীয় হিন্দু পণ্ডিতগণ দ্বারা আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করার বিষয়টি সেই কালের বিজ্ঞ আল-বেরুনীর পক্ষে একদমই বোধগম্য ছিল না। যেটা আদপেই কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আকাশের প্রতি শব্দগুণ আরোপ করার প্রসঙ্গটি, পীথাগোরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৫৭২–৪৯৯ অব্দ) নামক একজন প্রসিদ্ধ গ্রিক দার্শনিকের "গোলক-সঙ্গীত" মতবাদের সাথে পরোক্ষভাবে গভীর যোগসূত্র স্থাপন করা যেতে পারে।

পীথাগোরাসের মতে পৃথিবী গোলাকার। কারণ, একজন সুদক্ষ গণিতবিদ হিসেবে তিনি মনে করতেন গোল পৃথিবীই হল সর্বোত্তম জ্যামিতিক আকার। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করে। এই কক্ষগুলি হল সমকেন্দ্রিক বৃত্ত। এই আকাশস্থ বস্তুসমূহের প্রত্যেকটি এক একটি গোলকে আবদ্ধ। এদের দ্রুত আবর্তনের ফলে বাতাসে আলাদা আলাদা সুরের সৃষ্টি হয়। তারের দৈর্ঘ্যের উপর যেমন সুরের প্রবাহ নির্ভর করে, তেমনি গ্রহগুলোর পথের দৈর্ঘ্যের উপরও সুরের তারতম্য হয়। গ্রহসমূহের পথ এক একটি বিরাট গোলাকার তার। সঙ্গীতের নিয়ম অনুসারেই আলাদা আলাদা গ্রহের জন্য আরাদা আলাদা সুরের সৃষ্টি হয়। সাধারণ মানুষ আজন্ম এই সঙ্গীতের মাঝে ডুবে আছে বলে এ সঙ্গীত শুনতে পয় না। অতএব, পীথাগোরাস নিজে মনে করেন, এই

বিশ্বসঙ্গীত নির্ণয় করাই হচ্ছে দার্শনিকের কাজ। পক্ষান্তরে, আরেকজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক এরিস্টটল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮৪–৩২২ অব্দ) পীথাগোরাসের "গোলক-সঙ্গীত" নামক মতবাদটি আদৌ সমর্থন করতেন না। অনবরত এই সঙ্গীত চলছে, সেজন্য আমরা এর শব্দ শুনতে পাই না, এ কথাও তিনি বিশ্বাস করতেন না। তিনি বলতেন, এই সকল আকাশস্থ বস্তু যদি কোনো শব্দের সৃষ্টি করে, তাহলে সেই শব্দ খুব নিকট হওয়াই স্বাভাবিক এবং সেই শব্দ যতই অনবরত চলুক না কেন, সাধারণ মানুষ সেটা শুনবে না, তা হতেই পারে না।

আমরা প্রায় সকলেই জানি, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পরীক্ষাসিদ্ধ সিদ্ধান্ত অনুসারে 'শব্দ' হচ্ছে শক্তির একটি বিশেষ তরঙ্গ রূপ যা আমাদের কানে শোনার অনুভূতি জাগায়। তথাপি, শব্দ বিস্তারের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের দরকার হয়। শব্দের উৎস ও আমাদের কানের মধ্যবর্তী স্থানে যদি কোনো স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যম না থাকে তাহলে শব্দ আমাদের কানে পৌঁছাতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ, চাঁদে আদৌ কোনো বায়ুর বিস্তার নেই এবং চাঁদ হলো পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২ লক্ষ ৩৯ হাজার মাইল বা ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪০৩ কিলোমিটার। অপরদিকে, বায়ুমণ্ডলের গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার যা আমাদের ভূপৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে আছে। এ থেকে সহজেই বোঝা যায় বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ অতিক্রম করার পর সেখানে শব্দ শুনতে পাওয়া অসম্ভব। এখন যদি চাঁদের পিঠে কোনো প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে তা পৃথিবীতে কখনও শোনা যাবে না। কারণ, শূন্যের মধ্য দিয়ে শব্দ সঞ্চালিত হতে পারে না। এরিস্টটলের "আকাশস্থ বস্তু দ্বারা সৃষ্ট শব্দ শুনতে পাওয়া" এবং পীথাগোরাসের "গোলক-সঙ্গীত" মতবাদটিতে "আকাশস্থ বস্তুসমূহে বায়ু মাধ্যমে সুরের সৃষ্টি" বক্তব্যদ্বয় আমার মতে আদৌ যুক্তিসঙ্গত নয়। তারপরও, পীথাগোরাসের "গোলক-সঙ্গীত" মতবাদটি পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য না হলেও, আমি ব্যক্তিগতভাবে কিছুটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মতবাদটিকে গুরুত্ব দিতে চাই। কারণ, পীথাগোরাস ব্যক্তিগতভাবে 'বিশ্বসঙ্গীত' নির্ণয় করার জন্য অন্যান্য দার্শনিকদের উৎসাহ যুগিয়েছেন। এখন, একজন নবীন বিজ্ঞানী কিংবা নবীন দার্শনিক হিসেবে আমার কাজ হচ্ছে এই বিশ্বচক্রের মাঝে 'বিশ্বসঙ্গীত' নামক শব্দটির প্রকৃত মর্ম খুঁজে বের করা।

'বিশ্বসঙ্গীত' নামক শব্দটিকে মাথায় রেখে আসা যাক "তাওবাদ" প্রসঙ্গে। "তাওবাদ" এমন একটি দর্শন যা পরে ধর্মেও রূপান্তরিত হয়েছিল। এর মূল গ্রন্থটি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে চীনা দার্শনিক লাও জ্যু রচিত **তাও তে চিং**। 'তাও' শব্দটির অর্থ পথ বা উপায়। "তাওবাদ" মনে করে প্রকৃতির নিয়মই হলো পরম। বস্তুত, যারা প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলে তারা প্রবাহিত হয় তাও-এর গতির সাথে। বস্তুজগতের রহস্য উদঘাটনে মানুষের আগ্রহ চিরকালীন। অতিপারমাণবিক কণা থেকে শুরু করে সুদূর নক্ষত্ররাশি পর্যন্ত ছড়িয়ে রয়েছে পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ। তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞঅনের সুপরিচিত পণ্ডিত ফ্রিটজফ কাপরা প্রাচীন চীনের "তাওবাদ" দ্বারা দারুণ প্রভাবিত হন। ফলস্বরূপ, তিনি ওনার লেখা বিখ্যাত বই ***The Tao of Physics***-এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জগৎচক্রের মাঝে প্রায়শ অনুসন্ধান করেছেন প্রকৃতিকে। কার্যত, কপরার বক্তব্য অনুসারে আমরা জানতে পারি কোন পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলোর বন্দিত্বের ফলাফল হল প্রায় প্রতি সেকেন্ডে ৬০০ মাইলের তীব্র বেগ। এই উচ্চ গতির কারণে পরমাণুগুলোকে মনে হয় দৃঢ় গোলকের মত, যেমন একটি দ্রুত গতিশীল প্রপেলারকে মনে হয় একটি চাকতি। পরমাণুগুলোকে আরো সংকোচিত করা খুবই কঠিন এবং এভাবে এরা বস্তুকে প্রদান করে পরিচিত দৃঢ়তার বৈশিষ্ট্য।

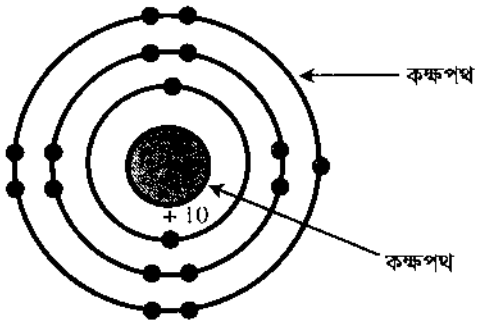

পারমাণবিক কক্ষপথ

এটা প্রায় সবারই জানা যে, পরমাণু শুধু আমাদের এই পৃথিবীর বুকেই নয় বরং ছড়িয়ে আছে মহাকাশের দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রসহ সকল স্থানে। পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো কক্ষপথগুলোতে এমনভাবে অভিযোজিত হয় যে, নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ এবং বন্দিত্বের প্রতি এদের অনীহার মধ্যে একটি সর্বাপেক্ষা অনুকূল ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তবে, পারমাণবিক কক্ষপথগুলি আমাদের মহাকাশীয় বস্তুসমূহের কক্ষপথের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ, এর পার্থক্য সৃষ্টি হয় ইলেকট্রনগুলোর তরঙ্গ-প্রকৃতি থেকে। একটি ক্ষুদ্র সৌরজগতের মত করে একটি পরমাণুকে কখনো চিত্রায়িত করা যায় না। নিউক্লিয়াসের চারদিকে বৃত্তপথে ঘূর্ণায়মান কণাগুলোর বদলে আমাদের কল্পনা করতে হবে বিভিন্ন কক্ষপথে বিন্যস্ত সম্ভাব্য তরঙ্গগুলোকে। বস্তুত, কক্ষপথসমূহে ইলেকট্রন-তরঙ্গগুলোকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে যেন এদের সমাপ্তিবিন্দুগুলো পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ, এরা গঠন করে স্থির-তরঙ্গের মত সজ্জা। এই কারণে, ফ্রিটজফ কাপরার বক্তব্য অনুসারে বলা যায় যে, এই সজ্জাগুলোর তখনই উদ্ভব ঘটে যখন তরঙ্গগুলো কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে গিটারের কম্পনরত তারের তরঙ্গগুলোর মত কিংবা কোনো বাঁশির ভেতরের বায়ুর কম্পনের মত। সুতরাং, একজন নবীন লেখক হিসেবে আমি এটাকেই 'বিশ্বসঙ্গীত' হিসেবে আখ্যায়িত করব। কার্যত, এটা সেই সঙ্গীত যা পীথাগোরাসের ভাষায় সাধারণ মানুষের পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। বরং, এই সঙ্গীতকে শুধুই বিজ্ঞানসম্মত গবেষণার মাধ্যমে নির্ণয় করা যেতে পারে।

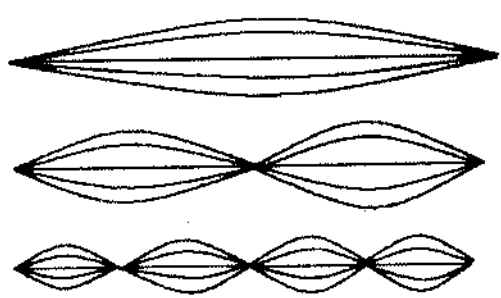
বিশ্বসঙ্গীতরূপে কম্পমান তার স্থির-তরঙ্গ সজ্জা

যাই হোক, বিশ্বসঙ্গীতের আরেকটি রূপ হিসেবে সূর্য থেকে পৃথিবীর বুকে যে আলো এসে পড়ে তা হল আসলে এক জটিল ধরনের মিশ্রণবিশেষ। কোনো সন্দেহ নেই যে, সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করে। সূর্যের বুকে যে পদার্থ রয়েছে, সেই পদার্থগুলোর একেক পদার্থের পরমাণুর একেক

রকম স্পন্দন রয়েছে। এই বিভিন্ন রকমের স্পন্দন বিকিরণ ছাড়ানোর সময় একেক ধরনের তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে। এক এক ধরনের পরমাণু যেমন এক এক রকমের স্পন্দন ব্যবহার করে। তেমনি অন্য পরমাণুও অন্যরকম স্পন্দন ব্যবহার করে। এর ফলেই আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্য ঘটে।

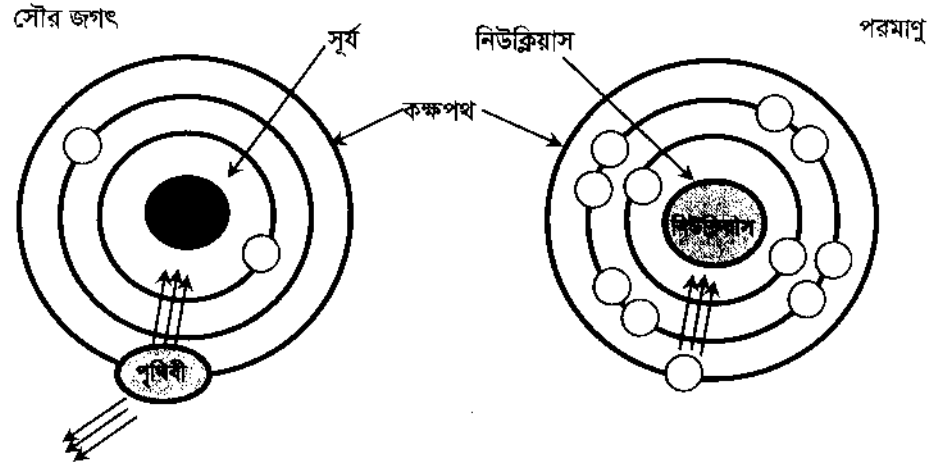

সূর্যপ্রভব আলোর প্রতিমান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশ্বসংসারে যাবতীয় পদার্থ যেমন অজৈব ও জৈব অথবা জীবন্ত বস্তু সকল কিছুই গঠিত হয় নানা রকমের ও নানা বৈশিষ্ট্যের পরমাণু দিয়ে। অধিকন্তু, বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৯২ প্রকারের প্রাকৃতিক পরমাণু আবিষ্কার করেছেন। অগণিত পদার্থ, যাদের আমরা পৃথিবীর উপর দেখি, যেমন কত রকমের খনিজ পদার্থ, মূল্যবান পাথর তথা মণিমুক্তা, ইট, কাঠ, এবং যাবতীয় জীবন্ত বস্তু, জল, তেল ইত্যাদি তরল পদার্থ। এর সকল কিছুই এই ৯২টি মৌলের সমন্বয়মাত্র। ঠিক একই রকম পদার্থ অর্থাৎ ৯২টি মৌলই কম-বেশি হারে পাওয়া যায় সূর্যের দেহে এবং মহাকাশের অন্যান্য নক্ষত্রের দেহেও। সে নক্ষত্র যদি ৫০০ আলোকবর্ষ দূরেও হয়, সেখানেও এই বস্তু মিলবে। এমনকি মহাকাশে ভাসমান মেঘমালাতেও এই মৌলের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। তার মানে শুধু পৃথিবী নয়, জগৎচক্র নামক গোটা মহাবিশ্বও এই ৯২টি পদার্থ দিয়ে গঠিত। সত্যি বলতে, 'পরমাণু' এমন একটি বিষয় যা আমার এই ছোট্ট প্রবন্ধটিতে লিখে শেষ করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই, আমার এই সামান্য লেখা আর দীর্ঘ না করে, কবি পরিমল কান্তি পালের **শতদল** নামক কাব্যগ্রন্থের "পরমাণু" কবিতার প্রথম চার পঙ্‌ক্তি দিয়ে শেষ করতে চাই:

"তুমি কি ভেবেছ কখনো অণু-পরমাণুর স্মৃতিকথা,
বিজ্ঞানের অভিযাত্রায় প্রগতির পথে অনুরাগে গাঁথা।
মহাজগতে সৃজনের আধার পরমাণু উজ্জ্বল অজর,
স্বাধীন সত্তার অবয়ব অণু শোভাকর প্রেম-নির্ঝর।"

প্রবন্ধকার : মো: রিদওয়ানুর রহমান, স্নাতকোত্তর (ইংরেজি), নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।

পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির সমন্বিত ব্যবহার ঃ একটি নতুন প্রস্তাব

শহিদুল ইসলাম

বিজ্ঞানের এই চরম উৎকর্ষতার যুগে জগতে আজ মহাজাগরণের মহোৎসব চলছে। হাইটেকের এই মানুষ গ্লোবাল ভিলেজ থেকে গ্লোবাল ফ্যামিলিতে পরিণত হয়েছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে আদিম চিন্তা চেতনা ও আবিষ্কার থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নতুন পদ্ধতি ও কলাকৌশল মানুষকে প্রবাহিত করে চলেছে। প্রাচীনকালে মানুষ বনের হিংস্র প্রাণী এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভয়-ভীতি থেকে বাঁচার জন্য যখন প্রকৃতির কাছে সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়েছে, তখন সে প্রকৃতির বৈরী পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছে। এই মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং শিকার করার জন্য পাথরের হাতিয়ার তৈরি করেছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভয়-ভীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য গুহার ভিতর বসবাস করেছে। গুহাবাসী মানুষ তার চিন্তা দ্বারা ঘরবাড়ি এবং পাতার ছাউনি জলোচ্ছ্বাস এবং ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবে লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। বারবার ঘর বেঁধে যখন নিরাশ হয়েছে তখন শক্তভাবে ঘর তৈরি করার মনস্থির করেছে। পাথর দিয়ে, মাটি পুড়িয়ে শক্ত করে কাঠ চিড়ে গৃহনির্মাণ করতে শিখেছে। এই নির্মাণ শৈলী ধীরে ধীরে উন্নত থেকে উন্নততর পর্যায়ে পৌঁছেছে। মানুষের আগুন আবিষ্কার সভ্যতার ইতিহাসে বিস্ময়কর ঘটনা। এই আগুনের তাপ দ্বারা ধাতু গলাতে শেখা এবং চাকা তৈরি করা সভ্যতার চাকাকে যে সামনের দিকে চালিয়েছে যার কারণে আর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কার, কাগজ তৈরি করে তথ্য জগতে বিপ্লব সাধন করেছে। আদিম মানুষ স্বপ্ন দেখতো পাখির মতো আকাশে উড়তে, মাছের মতো সাঁতার কাটতে। সে তার সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করার জন্য আজ আবিষ্কার করেছে যন্ত্র, উড়োজাহাজ, ডুবোজাহাজ, ডিজেল ইঞ্জিন, বাষ্প চালিত ইঞ্জিন যা তার গতিকে বৃদ্ধি করেছে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল দ্রুতগতিতে এগিয়ে বৃদ্ধি করেছে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে। বিশেষ করে বিদ্যুৎ আবিষ্কার মানব সভ্যতাকে অসম্ভব দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়েছে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় মানুষ একে একে আবিষ্কার করে তাক লাগিয়ে দিচ্ছে বিশ্ব বিবেককে। এই বিজ্ঞান ব্যবহার হচ্ছে চিকিৎসায়, শিক্ষায়, গবেষণায়, কৃষিতে, শিল্পে সর্বপরি সভ্যতায়।

কৃষি তথ্য জগতের একটি অংশ, এটা বুঝতে হলে আমাদেরকে কৃষির ঐতিহাসিক বিবর্তনের দিকে একটু নজর দিতে হবে। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে একজন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষক যে কয়জন মানুষের জন্য খাদ্য এবং সুতা উৎপাদন করত এখন প্রত্যেক কৃষক তার প্রায় ১৫ গুণ বেশি উৎপাদন করে। ১৯৫০ এবং ১৯৬০ সালে খামারের মোট জমির পরিমাণ ১.২ বিলিয়ন একরে পৌঁছেছিল। ১৯৩০ সালে খামারের সংখ্যা প্রায় ৬.৮ মিলিয়ন ছিল। বর্তমানে প্রায় ২ মিলিয়ন খামারে ১ বিলিয়ন একর জমির কাছাকাছি কাজ করা হয়। অল্প সংখ্যক খামার, অল্প সংখ্যক শ্রমিক ব্যবহার করে জন

প্রতি অনেক খাদ্য উৎপাদন করছে যা পূর্বে কখনও ছিল না। কতিপয় শিল্পের মধ্যে কৃষি একটা শিল্প যেখানে উৎপাদন করে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যোগান এবং চাহিদা অনুসারে মূল্য নির্ধারণ হয় বলে বিক্রি করে। অন্যদিকে উৎপাদনকারী বাজারে মজুত রাখে যাতে পূর্ণপ্রতিযোগিতার সময় একবারে বন্ধ না হয়ে যায়। মুক্ত বাজারে কৃষিজাত পণ্যের মূল্যের উপর ইহার গুণগতমান নির্ণয় করা হয় এবং খরচ অপূর্ণপ্রতিযোগিতার অবস্থার উপর নির্ভর করে। এই অবস্থায় খরচের উপর মূল্য নির্ভর করে যেখানে খরচের দাম দ্রুত বাড়তে পারে না। এভাবে কৃষিকে ব্যবসা হিসেবে টিকতে হলে প্রত্যেকটি কাজকে আরও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। দক্ষতা এবং উৎপাদন কম খরচ, নতুন প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার মাধ্যমে সম্ভব। ১৯৮০ দশকের মাঝের দিকে এই দক্ষতা শুধু শ্রমিক কমিয়ে আনায় কৌশলের উপরও গড়ে উঠেছিল।

আজকের দিনের কৃষি উৎপাদনকারীকে ব্যবসায় টিকে থাকতে হলে শস্য জন্মানো, রোগ প্রতিরোধ, সার প্রয়োগ কীটনাশক এবং আগাছা দমনের উপর যথাসম্ভব ভাল তথ্য ভিত্তিক জ্ঞান থাকতে হবে। তাছাড়া উৎপাদনকারীকে শস্য আহরণের পূর্বে অনিশ্চিত বিক্রয়যোগ্য পণ্যকে বাজারজাতকরণের সুপরিকল্পনাও থাকতে হবে। বহু উপযুক্ত তথ্য নিরাপত্তা পাওয়ার জন্য একজন কৃষককে মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তি প্রয়োজন যেখানে বিশেষ চালনার মাধ্যমে অনেকগুলো ডাটা নির্ভর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নির্বাচন করা যাবে। কতিপয় উদাহরণ ব্যাখ্যা করা হল ঃ

(১) ৯৮° ফারেনহাইটের উপরে মোরগ-মুরগী অথবা পাখিদের বেঁচে থাকা কষ্টকর। গরম ঋতুতে পাখিদের শীতল শান্তি ঘর প্রযুক্তি করার জন্য দুই দিনের মতো সময় দেবে অন্যথায় তারা হিট স্ট্রোকে মারা যাবে। প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টির জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি সময় দিয়ে থাকে।

(২) কিছু কিছু শস্য সফলভাবে আহরণের ক্ষেত্রে শুষ্ক অবস্থা অতি প্রয়োজনীয়। খড় কাটার পর তিন দিন শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন নয়তোবা ইহা মাঠে পচে যাবে। এখানে আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রয়োজন।

(৩) আবহাওয়ার অবস্থার উপর পোকামাকড়ের জন্মানো অথবা মরা নির্ভর করে। কীটনাশকের ব্যবহার কমিয়ে সঠিক সময়ে শস্যের জন্য রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া দেখে উৎপাদনাকারী বুঝতে পারে কখন ঔষধ ছিটাতে হবে। কিছু ছিটানো ঔষধ আছে যা এক বা দুই দিন কার্যকারিতা থাকে।

(৪) পশুখাদ্য ব্যবসায় মুনাফা ব্যাপকভাবে নির্ভর করে পশুর মূল্য এবং খাদ্যের মূল্যের সম্পর্কের উপর। বাস্তবিকই পশুখাদ্য দাতাদের এই সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং দিনের পর দিন সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। যেখানে গো-খাদ্যের উপাদান সহজে পাওয়া যায়, খাদ্য দাতার কাজ হবে সমস্ত মূল্য একত্রিত করে পশুর মূল্যের তথ্যের সাথে যুক্ত করা এবং

দৈনিক খাদ্যের তালিকা প্রস্তুত করা। পশু খাদ্যের উপাদানের সংখ্যা যদি অধিক হয় তখন সেটা দারুন জটিল আকার ধারণ করে। এ ধরনের ডাটা বিশ্লেষণ করার জন্য মাইক্রোপ্রসেসর ব্যবহার করা যেতে পারে এবং ইহা খাদ্য দাতার সুবিধাজনক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। সুবিধাজনক ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত আশা করতে হলে উৎপাদনকারীকে খামার পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য তথ্য অবশ্যই থাকতে হবে। ইহা ক্রম উন্নতির ধাপ, পরিচালনার রেকর্ড রাখার সাথে জড়িত শস্য এবং পশুর রেকর্ড রাখাই শেষ নয়। উৎপাদনের খরচের কাঠামো এবং বিনিয়োগও রাখতে হয়। এই তথ্য ব্যাপক আকারের হতে পারে। মাইক্রোপ্রসেসর প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

কৃষিকে আরও উৎপাদনমুখী করার জন্য দরকার কৃষিভিত্তিক ওয়েবসাইট। মিডিয়া যেমন বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র কৃষিভিত্তিক অনুষ্ঠান নাটিকা, প্রতিবেদন প্রচারের মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ দরকার। এমনকি গানের মাধ্যমেও কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। ওয়েবসাইডে কৃষি, কৃষিজ এর সাথে জড়িত বিষয়গুলো তথ্যবহুল সন্নিবেশন করলে আধুনিক কৃষিজ উৎপাদনে সেটা ত্বরান্বিত করবে। কৃষিভিত্তিক প্রকাশনা সহজে কৃষকদের হাতে পৌছালে এবং সেটা কৃষি বান্ধব হলে কৃষক সেটা সহজে আয়ত্ব করে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে। গ্রামে গ্রামে প্রজেক্ট প্রদর্শনের আয়োজন করলে সেটার সুফল কৃষকরা পাবে। উপজেলায় উপজেলায় কৃষি মেলার আয়োজন করলে এবং কৃষিজ দ্রব্য প্রদর্শনের আয়োজন করলে জনসাধারণের দ্বার গোড়ায় সেটা পৌছানো সম্ভব হবে। কৃষিকে আরও উৎপাদনমুখী করার জন্য কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও আধুনিক কৃষি যন্ত্রের উপর জ্ঞান থাকতে হবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে শিল্প বিপ্লব কৃষি ক্ষেত্রে যুগান্তর পরিবর্তন এনেছে। এ সময় থেকেই কৃষকদের হাতে এসেছে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি এবং কৃষি পদ্ধতিতে এসেছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

অসংখ্য নিড়ানি সমন্বিত এক একটি কৃষিযন্ত্র চাষ আবাদের জন্য জমি তৈরিতে মানুষকে বিপুল সাহায্য করেছে। লাঙ্গল দিয়ে একজন কৃষক সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রমেও খুব অল্প জমিই চাষ করতে পারে। কাস্তে দিয়ে ফসল কাটার তুলনায় শষ্য ছেদনকারী যন্ত্র (মোয়ার) ব্যবহারে সুবিধা অনেক। দাঁতাল র‍্যাঁদাযুক্ত মই জমি মসৃন করা এবং শস্য, খড় ইত্যাদি গাদা করার কাজে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। এছাড়া কপিকল জাতীয় যন্ত্র কৃষিকার্যে অশেষ সহযোগিতা করছে। কৃষি ক্ষেত্রে আজ সবসময় ব্যবহৃত হয় নানা ধরনের ফসল কাটার যন্ত্র (রপার)। অসংখ্য রকম ফসল বন্ধনকারী যন্ত্র (বাইন্ডার) এবং ফসল সংগ্রহের বিশেষ যন্ত্র (হারভেস্টিটং মেশিন)। শস্যাদি মাড়াইয়ের যন্ত্রগুলো (থ্রেশিং মেশিন)। কয়েকজন মাত্র লোকের পরিচালনায় দুই তিন দিনে যে পরিমাণ কাজ করছে, এক-একটি পরিবার সারা ঋতু জুড়ে পরিশ্রম করেও তা সম্পন্ন করতে পারবে না।

খামারের অন্যান্য যন্ত্রপাতির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈদ্যুতিক দোহক-যন্ত্র (মিল্কার), শীতলকারী যন্ত্র (কুলার), মাখন-তোলা যন্ত্র (ক্রিম-সেপারেশন), ভোজ দ্রব্য-পোষক যন্ত্র (ফিড গ্রাইন্ডার) এবং

সার ছিটানোর যন্ত্র (ম্যানিউর স্পেডার) ইত্যাদি। সম্প্রতি কৃষিকায্যে নানা ধরনের যন্ত্রকে কাজে লাগানো হচ্ছে পেট্রোল চালিত ইঞ্জিন অথবা ট্রাক্টরের সাহায্যে।

সেলফ বাইন্ডার বা স্বয়ং বন্ধনকারী যন্ত্র ফসল কাটার সঙ্গে সঙ্গে আঁটি শস্যের বাঁধে, তবে ফসল কাটার যন্ত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল কম্বাইন হারভেস্টার। যন্ত্রটি একই সঙ্গে ফসল কাটে এবং ঝাড়াই-মাড়াই করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশের খামারগুলোতে শক্তিশালী এক-একটি ট্রাক্টর তিন-চারটি পর্যন্ত ফসল কাটার যন্ত্রকে একসঙ্গে কাজে লাগানো এবং ১০০ একর পর্যন্ত জমির কাজ একদিনে সারতে পারে।

বিজ্ঞানের বদৌলতে শুধু কৃষি পদ্ধতি ও চাষাবাদের কায়দা-কানুন বদলায়নি। খামারজাত ফলনে এবং যেখানে উৎপাদিত জীবজন্তুর আকৃতিতেও এসেছে বিরাট পরিবর্তন। বহু শতাব্দী ধরে কৃষিকার্যে এবং গৃহপালিত জীবজন্তুর প্রজননে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফসল উৎপাদনে ও পশুপালনে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে। তাই সহজেই বিচিত্র ধরনের শস্য ও ফলমূল উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। গৃহপালিত জীবজন্তুর চেহারাও আনা সম্ভব হয়েছে এমন সব উন্নত পরিবর্তন যা তাদের বন্য পূর্বসুরীদের থেকে বিস্ময়করভাবে স্বতন্ত্র। যে ঘোড়া মাল টানবে আর যে ব্যবহৃত হবে দ্রুত ছোটার কাজে, তাদের প্রজনন পদ্ধতি আজ আলাদা। গবাদি পশুর প্রজনেও এসেছে বৈচিত্র। কোথাও ভাল মাংসের দিকে নজর রেখে আবার কোথাও বেশি দুধ উৎপাদনের কথা ভেবে প্রজনন এবং লালন পালনে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ভেড়ার ক্ষেত্রে গুরুত্ব কোথাও তার মাংসের উপর, কোথার আবার তার পশমের উৎকর্ষ ও পরিমাণের উপর। এছাড়া বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির অনুসরণের ফলেই আজ ডিম উৎপাদনে বিশেষ উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়েছে। ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দে রবার্ট বেকওয়েল কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হাঁস-মুরগির খামারে বিদ্যুৎ যন্ত্রের সাহায্যে দিনের যত আলোকজ্জ্বল পরিবেশ সৃষ্টির ফলে প্রকারন্তরে দিনই প্রলাম্বিত হয় এবং ডিম-পাড়া, ডিম ফোটানো ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ গড়ে উঠে।

ফলমূল ও শস্যাদি উৎপাদনে বিস্ময়ের উপাদান নান দিকে। বীজ নির্বাচনে সতর্কতা নতুন ও উন্নত ধরনের গাছপালার প্রজনন ব্যবস্থা এবং বীজ অংকুরন ও গাছের কলম ব্যবহারের নতুন নতুন ব্যবস্থা কৃষি কাজে বিপ্লব এনেছে। আলু উৎপাদনের সময় লক্ষ্য রাখা হচ্ছে যাতে তার ফলন বাড়ে। তার গা মসৃন হয় এবং উৎপাদিত ফসল আকারে হয় অপেক্ষাকৃত বড়। বুনো টক আপেলের জায়গায় আজ এক হাজারেরও বেশি প্রজাতির আপেল উৎপাদিত হচ্ছে। আকারে, বর্ণে, গন্ধে এ বিশেষ ফলটিতে যে বৈচিত্র আনা হয়েছে এক কথায় তা চমৎকার। আঙ্গুর উৎপাদনেও এসেছে যুগান্তকারী পরিবর্তন। অল্পময় বীজে এরা ছোট ছোট ফলের জায়গায় এমন এমন সব আঙ্গুর ফলানো হচ্ছে যেগুলো স্বাদে মধুর, রসে পরিপূর্ণ এবং বীজের আধিক্য থেকে প্রায় মুক্ত। এমনকি কোন কোন শস্যের গঠনমূলক উৎপাদনে পরিবর্তন ঘটানো হচ্ছে- যাতে বেশি পরিমাণ প্রোটিন শর্করা বা তেল জাতীয় বস্তু প্রয়োজন অনুযায়ী লাভ করা যায়। এ ধরনের প্রয়াসে কৃষি রসায়নবিদ্যা বা এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি

পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করছে। বিজ্ঞানের এই বিশেষ শাখাটির সাহায্যে আমরা জানতে পারি বিশেষ কোনো প্রকারের মাটিতে গাছপালার কী কী বিশেষ খাদ্য বিরাজ করছে এবং নিকৃষ্ট মানের মাটি বা জমির উন্নতি কল্পে কী কী সার/পদার্থ প্রয়োজন।

পশু রোগ সংক্রান্ত বিজ্ঞান (ভেটেরিনারি সায়েন্স) খামারের পশুদের মধ্যে রোগ জনিত মৃত্যুহার বিপুল পরিমাণ কমিয়েছে। গাছপালা ও শস্যাদির মধ্যে নানা ধরনের পতঙ্গের উৎপাত, জীবাণুর সংক্রমন ও রোগ থেকে যেসব ক্ষতি হয় সাম্প্রতিককালে সে সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা হয়েছে। কোন কোন ধরনের পতঙ্গ বিভাগ (অ্যানাট্যামলজি) জানতে সাহায্য করছে। কোন কোন ধরনের পতঙ্গ কৃষি উৎপাদনে সহায়তা করে এবং কোনগুলো ফসল ও গাছপালার পক্ষে ক্ষতিকর। কৃষকরা বিপদজনক পতঙ্গ বা পোকামাকড় সম্পর্কে আজকাল আগে থেকেই সাবধান হওয়ায় সুযোগ পায়, অপরদিকে যারা কৃষিকার্যের অনুকূল তাদের অস্তিত্ব রক্ষার আগ্রহ দেখায়।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় অতীতের উন্নত জাতিগুলো কৃষিকার্যেও উন্নত ছিল। প্রাচীন মিশরীয়রা পালাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন শস্যের চাষ জানত। কৃত্রিম জলসেচন পদ্ধতির সাথে তারা পরিচিত ছিল। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে ডিম ফুটানোর কার্যক্রমও তাদের অজানা ছিল না। উন্নত ধরনের জলসেচন পদ্ধতি প্রাচীন ভারত ও ব্যাবিলনে প্রচলিত ছিল। পারস্যে একসময় চালু ছিল প্রশার বাঁচের ক্ষেত (ইনটেন্সিভ ফার্মিং)। জলসেচন পদ্ধতি জমিচাষ প্রক্রিয়া। সার ব্যবহার পদ্ধতি কাজে প্রাচীন রোমানরা ছিল অগ্রদূত।

অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে দুই ঘণ্টারও কম সময়ে এক একর গমের জমির চাষাবাদ সংক্রান্ত সমস্ত কাজ শেষ করা যায়। পুরানো পদ্ধতিতে এ একই কাজ করতে সময় লাগত ৬০ ঘণ্টারও বেশি। বস্তুত বিজ্ঞান আজ যেন অসাধ্যকে সাধন করেছে। উষর, মরুভূমি, হাজার বছরের পতিত জমি যেসব জায়গায় ফসল ফলানোর কথা কল্পনাও করা যেত না সেখানেও আজ অতি প্রয়োজনীয় সব ফসল ফলেছে। এককথায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছে ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞান শক্তি ও প্রযুক্তি। তাই পরিবর্তনশীল কৃষি উৎপাদনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তির জ্ঞান আমাদের একান্ত প্রয়োজন। আর এই জ্ঞান আয়ত্বের মাধ্যমে আমরা উৎপাদনে বিপ্লব ঘটিয়ে উন্নত অর্থনীতি ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করবো। এটাই একান্তভাবে আশা করা যাচ্ছে।

প্রবন্ধকার : প্রভাষক, ইস্পাহানী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, রামেরকান্দা, রোহিতপুর, কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

আমের প্রধান রোগসমূহ ও তাদের দমন ব্যবস্থাপনা

মোঃ নজরুল ইসলাম

বাংলাদেশে উৎপাদিত ফলসমূহের মধ্যে আম অন্যতম। স্বাদে, গন্ধে ও তৃপ্তি প্রদানে আম অতুলনীয়। তাই আমকে ফলের রাজা বলা হয়। আম পছন্দ করে না এমন লোক হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। বাংলাদেশের সব এলাকাকে আম গাছ দেখা গেলেও চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, দিনাজপুর, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আম চাষ হয়ে থাকে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় আমাদের দেশে আমের ফলন বেশ কম। হেক্ট প্রতি মাত্র ৪.০০ টন। অথচ আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতে আমের ফলন হেক্টর প্রতি প্রায় ১০.০০ টন। ফলন কম হওয়ার কারণ অনেক, তবে রোগ বালাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করে থাকে বলে ধারনা করা হয়। রোগ বালাই এর উপর আবহাওয়ার যথেষ্ট প্রভাব আছে। আবহাওয়া অনুকূল হলে রোগ জীবাণুর বেঁচে থাকা, বংশ বৃদ্ধি, আক্রমণ ও বিস্তার সহজ হয়। প্রধান প্রধান রোগগুলো আমের মুকুল, কচি পাতা, পাতার কুঁড়ি এবং সংগ্রহোত্তর আমে আক্রমণ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে। পোকা দমনের ক্ষেত্রে আম চাষীগণ কিছুটা অগ্রগতি অর্জন করলেও রোগ দমনের ক্ষেত্রে তাদের ধারণা একেবারেই কম।

আমের উৎপাদন বাড়াতে হলে রোগ দমন অপরিহার্য। একটা কথা মনে রাখতে হবে রোগ দমনের চেয়ে প্রতিশেধক ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি উত্তম। পরিচ্ছন্ন চাষাবাদ, পরগাছা দমন, রোগাক্রান্ত ডালপালা নিয়মিত ছাটাইকরণ, নিয়মিত সার প্রয়োগ এবং সময়মতো পোকা দমন প্রতিষেধক ব্যবস্থা হিসেবে পরিচিত। রোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ৪টি মূলনীতি মেনে চলা উচিৎ। যথা- সঠিক বালাইনাশক নির্বাচন, বালাইনাশকের সঠিক মাত্রা নির্ধারণ, সঠিক সময়ে দমন এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ। এই মূলনীতিগুলো না মানলে কাংক্ষিত ফল পাওয়া যাবে না। অনেকে মনে করেন রোগ দমন অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে কিনা সেটাও বিবেচনা করা উচিৎ। আম গাছ বেশ বড় বিধায় যথাযথভাবে স্প্রে করা অসুবিধাজনক। তাই এ ব্যাপারে আমাদের সতর্ক হতে হবে।

আমাদের দেশে আমের প্রধান রোগ সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

১। এনথ্রাকনোজ (Anthracnose) :

রোগের লক্ষণ : এ রোগের আক্রমণ কচি পাতা, কান্ড, মুকুল, কুঁড়ি ও ফলে প্রকাশ পায়। পাতায় অসম আকৃতির ধূসর বাদামী বা কালচে রঙের দাগ পড়ে। পাশাপাশি দাগুলো একত্রিত হয়ে বড় দাগের সৃষ্টি করতে পারে। বেশি আক্রান্ত পাতা ঝরে পড়ে। কচি পাতার আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি দ্রুত মারা যায়। আমের মুকুল বা ফুল আক্রান্ত হলে কালো দাগ দেখা দেয়। ফুল মারা যায় ও ঝরে পড়ে। মুকুলে আক্রমণ হলে ফল ধারণ ব্যাহত হয়। আম ছোট অবস্থায় আক্রান্ত হলে আমের গায়ে কালো দাগ দেখা দেয়। আক্রান্ত ছোট আম ঝরে পড়ে। বাড়ন্ত আমে রোগের জীবাণু আক্রমণ করে সুপ্তাবস্থায় থাকে। এ সময় রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। আম পাকা শুরু করলে আমের মিষ্টতা বাড়তে থাকে তখন জীবাণু সক্রিয় হয়ে উঠে এবং পাকা আমে ধুসর বাদামী বা কালো দাগের সৃষ্টি করে। গুদামের আবহাওয়া অনুকুল হলে রোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করতে পারে। আম বড় হওয়ার সময় ঘন ঘন বৃষ্টি ও মেঘলা আবহাওয়া বিরাজ করলে আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার :

- প্রতি বছর রোগাক্রান্ত বা মরা ডালপালা ছাটাই করে পুড়ে ফেলতে হবে।
- গাছের রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা ও ঝরে পড়া আম সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে বা মাটি চাপা দিতে হবে।
- মুকুল রোগের আক্রমণ প্রতিহত করতে হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করতে হবে। মুকুল ১০-১৫ সেমি লম্বা হলেই ফুল ফোটার আগেই প্রথম স্প্রে শেষ করতে হবে। আম মটর দানার মতো হলে দ্বিতীয় বার স্প্রে করতে হবে। এতে কচি আমে আক্রমণ প্রতিহত করবে এবং আম ঝরে পড়া কম হবে। কীটনাশকের সাথে এসব ছত্রাকনাশক মিশিয়ে একত্রে স্প্রে করা যেতে পারে।
- বাড়ন্ত আমকে রোগমুক্ত রাখতে হলে আম সংগ্রহের ১৫ দিন আগ পর্যন্ত মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক বা একরোবেট এম জেড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে বা ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ১৫ দিনের ব্যবধানে ৩/৪ বার স্প্রে করতে হবে।
- গাছ থেকে আম পাড়ার পরপরই গরম পানিতে (৫৫ সে: তাপমাত্রায় ৫ মিনিট) ডুবিয়ে রাখার পর শুকিয়ে গুদামজাত করতে হবে।

২. বোঁটা পচা (Stem-end rot) :

রোগের লক্ষণ : আম গাছ থেকে পাড়ার পর পাকতে শুরু করলে বোঁটা পচা রোগের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। প্রথমে বোঁটার বাদামী অথবা কালো দাগ দেখা দেয়। দাগ দ্রুত বাড়তে থাকে এবং গোলাকার হয়ে বোঁটার চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। জীবাণু ফলের শাঁসকে আক্রমণ করে এনজাইম নিঃসরণের মাধ্যমে আমের কোষগুলোকে দ্রুত পঁচিয়ে ফেলতে পারে। আক্রান্ত আম ২/৩ দিনের মধ্যেই নষ্ট হয়ে যায়। রোগের জীবাণু বোঁটা ছাড়াও অন্যান্য আঘাতপ্রাপ্ত স্থান দিয়ে আমের ভিতর প্রবেশ করে আম পঁচিয়ে ফেলতে পারে।

প্রতিকার :

- মেঘমুক্ত রোদ্রোজ্জ্বল দিনে গাছ থেকে আম পাড়তে হবে। আম পাড়ার সময় যাতে আঘাত না পায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।
- ৫ সেমি (২ ইঞ্চি) বোটাসহ আম পাড়লে রোগের আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।
- আম পাড়ার পর গাছের তলায় জমা না রেখে দ্রুত সরিয়ে ফেলতে হবে।
- আম পাড়ার পর পরই গরম পানিতে (৫৫ সেঃ তাপমাত্রায় পানিতে ৫-৭ মিনিট) অথবা ব্যাভিস্টিন দ্রবনে (প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম) ৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখার পর গুদামজাত করলে বোঁটা পচার ভয় থাকে না।

৩। পাউডারী মিলডিউ (Powdery Mildew) :

রোগের লক্ষণ : পাউডারী মিলডিউ রোগের আক্রমণ প্রধানত আমের মুকুল ও কচি আমে প্রকাশ পায়। প্রথমে আমের মুকুলের শীর্ষ প্রান্তে সাদা বা ধূসর বর্ণের পাউডারের আবরণ দেখা যায়। এই

পাউডার হচ্ছে ছত্রাক জালিকা ও তার বীজ কণার সমষ্টি। হালকা বৃষ্টি, মেঘলা ও কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশ ও রোগের জীবাণুর ব্যাপক উৎপাদনে সহায়তা করে। অনুকূল আবহাওয়ায় এই পাউডার সম্পূর্ণ মুকুলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত মুকুলের সমস্ত ফুল নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থায় শুধুমাত্র মুকুলের দন্ডটি দাঁড়ায়ে থাকে। আক্রমণ বেশি হলে সমস্ত মুকুল নষ্ট হওয়ায় গাছে কোন ফলধারণ হয় না। কোন কোন সময় কম আক্রান্ত মুকুলে আম ধরতে দেখা যায়। তবে এ ধরনের আমের চামড়া খসখসে হয়। বেশি আক্রান্ত কচি আম ঝরে পড়ে।

বিস্তার : ছত্রাকের জীবাণু বাতাসের মাধ্যমে রোগাক্রান্ত মুকুল থেকে সুস্থ মুকুলে বিস্তার লাভ করে। আর্দ্র, গরম আবহাওয়া তৎসহ রাতের তাপমাত্রা কম থাকলে এ রোগ দ্রুত বাড়তে পারে। বীজকণা বাতাসের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে মুকুলের উপর পতিত হওয়ায় ৫/৭ ঘণ্টার মধ্যে অঙ্কুরোদগম হয়। মেঘাচ্ছন্ন ও সকালের ঘন কুয়াশায় রোগের জীবাণু দ্রুত বৃদ্ধি পায়।

প্রতিকার : মুকুল আসার সময় প্রতিদিন আম গাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে মুকুলে পাউডারী মিলডিউ রোগের আক্রমণ দেখা দিয়েছে কিনা। রোগের লক্ষণ দেখা দিলেই সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে।

৪। আমের আঠা ঝরা এবং হঠাৎ মড়ক (Gummosis and Sudden Decline) : বর্তমানে আম গাছের যে সমস্ত রোগ দেখা যায় তাদের মধ্যে আমের আঠা ঝরা এবং হঠাৎ মড়ক সবচেয়ে মারাত্মক। কারণ এ রোগে আক্রান্ত গাছ খুব অল্প সময়ের মধ্যে মারা যায়।

রোগের লক্ষণ : প্রথমে কান্ড বা ধড় অথবা মোটা ডালের কিছু কিছু জায়গা থেকে হালক বাদামি থেকে গাড় বাদামি বা কারো রঙের আঠা বা রস বের হতে থাকে। বেশি আক্রান্ত ডগা বা ডালটি অল্প দিনের মধ্যেই মারা যায়। এ অবস্থায় মরা ডালে পাতাগুলো ডগায় আঁটকে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে পাতাগুলো কিছুদিন পর ঝরে পড়ে। কিছুদিন পর দেখা যায় আরেকটি ডাল একইভাবে মারা যাচ্ছে। এভাবে এক পর্যায়ে সম্পূর্ণ গাছ মারা যেতে পারে।

প্রতিকার ঃ

- গাছে মরা বা ঘন ডালপালা থাকলে তা নিয়মিত ছাটাই করতে হবে।
- আক্রান্ত গাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ গোবর/ আবর্জনা পঁচা / কম্পোস্ট সার এবং রাসায়নিক সার ও পানির ব্যবস্থা করতে হবে।
- আঠা বা রস বের হওয়ার স্থানের ছাল/ বাকল কিছু সুস্থ অংশসহ তুলে ফেলে দিয়ে উক্ত স্থানে বোর্দো মিক্সার (১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানির সাথে মিশেয়ে পেস্ট তৈরি করা যায়) প্রলেপ দিতে হবে।
- আক্রান্ত ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশে রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দো পেস্টেল প্রলেপ দিতে হবে।
- গাছের নতুন পাতা বের হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম ১৫ দিনের ব্যবধানে ২ বার স্প্রে করলে নতুন ডগায় আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

৫। আগা মরা (Die Back) ঃ

লক্ষণ : রোগের জীবাণু প্রথমে কচি পাতায় আক্রমণ করে। আক্রান্ত পাতা বাদামি হয় এবং পাতার কিনারা মোড়িয়ে যায়। পাতাটি দ্রুত মারা যায় ও শুকিয়ে যায়। আক্রমণ পাতা থেকে কুঁড়িতে ছড়িয়ে পড়ে এবং ডগার অগ্রভাগ মেরে ফেলে। মরা অংশ নিচের দিকে অগ্রসর হতে থাকে ফলে বহু দূর থেকে আগা মড়া রোগের লক্ষণ বোঝা যায়। আক্রান্ত ডগাটির কোষ বিবর্ণ হয়ে উঠে। ডগাটি লম্বালম্বিভাবে কাটলে যা সহজেই নজরে পড়ে। পরিবহন কলায় বাদামি লম্বা দাগের সৃষ্টি করে। প্রাথমিক অবস্থায় রোগ দমন না করলে রোগ সমস্ত ডালে ছড়িয়ে পড়ে। আক্রমণ বেশি হলে গাছ মারা যেতে পারে।

বিস্তার : রোগের জীবাণু মরা ডাল বা পুরাতন পাতায় অবস্থান করে। রোগের বীজ কণা বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নতুন পাতা ও ডগায় আক্রমণ করে। উচ্চ তাপমাত্রা, শতকরা ৮০ ভাগের উর্ধ্বে বাতাসের আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাত এ রোগের আক্রমণ ও বিস্তারে অনুকুল অবস্থায় সৃষ্টি করে থাকে।

প্রতিকার ঃ

- আক্রান্ত ডাল কিছু সুস্থ অংশসহ কেটে পুড়ে ফেলতে হবে। কাটা অংশসহ রোগের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য বোর্দো পেষ্টের (১০০ গ্রাম তুঁতে ও ১০০ গ্রাম চুন ১ লিটার পানির সাথে মিশিয়ে পেস্ট তৈরী করা যায়) প্রলেপ দিতে হবে।
- গাছে নতুন পাতা বের হলে মেনকোজেব গ্রুপের ছত্রাকনাশক যেমন ডায়াথেন এম ৪৫/ পেনকোজেব/ ইন্ডোফিল/ কাফা ইত্যাদি (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে) ১৫ দিনের ব্যবধানে ২/৩ বার স্প্রে করলে নতুন ডগায় আক্রমণ প্রতিহত করা যায়।

৬। লাল মরিচ (Red Rust) :

লক্ষণ : লাল মরিচ রোগ প্রধানত পাতায় দেখা যায় তবে কোন কোন সময় পাতার বোটা বা কচি কান্ডে দেখা দিতে পারে। প্রথমে পাতায় ধূসর-সবুজ রং বিশিষ্ট দাগ পড়ে। পরবর্তীতে এই দাগ সুস্পষ্ট লালচে বাদামি রং ধারণ করে। দাগগুলি প্রায় গোলাকার এবং কিছুটা উঁচু মনে হয়। কয়েকটি দাগ একত্রিত হয়ে অসম আকৃতির বড় দাগের সৃষ্টি করে। দাগের মধ্যে অবস্থিত শৈবালের দেহ কিছুটা মখমলের মতো কোমল মনে হয়। শৈবালের মাথায় বীজ কণা থাকে যা বাতাসে ঝরে পড়লে দাগের রঙ ঘিয়ে রঙে রূপান্তরিত হয়। আক্রান্ত স্থানের কোষগুলি মারা যায়। আক্রমণ বেশি হলে পাতায় খাদ্য উৎপাদন এলাকা কমে যায় এবং গাছ দূর্বল হয়ে পড়ে।

বিস্তার : শৈবালের বীজকণা বাতাস অথবা বৃষ্টির ঝাপটার মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে নতুন পাতাকে আক্রমণ করে। অধিক তাপমাত্রা ও বাতাসের আর্দ্রতা এ রোগের বৃদ্ধি ও বিস্তারে সহযোগিতা করে তাই বর্ষাকালে এ রোগের আক্রমণ বেশি দেখা যায়।

প্রতিকার ঃ

- রোগ প্রতিরোধী জাতের আম গাছ লাগাতে হবে।
- রোগাক্রান্ত ঝরা পাতা সংগ্রহ করে পুড়ে ফেলতে হবে।

- কপার ঘটিত ছত্রাকনাশক যেমন -কুপ্রাভিট/ সালকক্স প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে অথবা বোর্দো মিক্সার ১৫ দিন পর পর ৪/৫ বার স্প্রে করে রোগমুক্ত রাখা যায়।
- ফলিকুর প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি হারে স্প্রে করে ও গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

৭. বিকৃতি (Malformation) :

লক্ষণ : সাধারণত দুই ধরনের বিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন-কান্ড বা দৈহিক বিকৃতি এবং মুকুলের বিকৃতি।

কান্ড বা দৈহিক বিকৃতি : প্রধাণত চারা বা ছোট গাছে এ ধরনের বিকৃতি দেখা যায়। আক্রান্ত কান্ডের মাথায় বা গিটে অসংখ্য নতুন ঝুঁড়ি বের হয়। কুঁড়িগুলো বেশ শক্ত ও ছোট ছোট পাতাযুক্ত হয়ে থাকে। কুঁড়িগুলো বড় হয় না বরং গিটের চতুর্দিকে আরো কুঁড়ি বের হয়ে জটলার সৃষ্টি করে। এক সময় নতুন ঝুঁড়িগুলো মারা যায়। মারাত্মকভাবে আক্রান্ত চারাগাছের বৃদ্ধি হয় না। এতে গাছ দুর্বল হয়ে মারা যেতে পারে। ৭/৮ বছরের বেশি বয়সের গাছে সাধারনত দৈহিক বিকৃতি দেখা যায় না।

মুকুলের বিকৃতি : মুকুলের বিকৃতি স্বভাবতই ফলবান গাছে পরিলক্ষিত হয়। রোগাক্রান্ত মুকুলে অসংখ্য শাখা-প্রশাখা বের হয়। এসব শাখা-প্রশাখা বেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, মোটা ও তুলনামূলকভাবে শক্ত হয়ে থাকে। দেখতে অনেকটা জটলতার মত মনে হয়। বিকৃত মুকুলে উভলিঙ্গ ফুল তেমন না থাকায় কোন ফল ধারণ করে না। বিকৃত মুকুল ২/৩ মাস পর্যন্ত গাছে আটকে থাকতে দেখা যায়। বিকৃত রোগের বিস্তার কিভাবে হয়ে থাকে তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে তবে এ রোগ বীজ দ্বারা বাহিত হয় না বলে জানা গেছে।

প্রতিকার ঃ

- রোগমুক্ত গাছের বীজ থেকে চারা উৎপাদন করতে হবে।
- কলম তৈরীর সময় রোগমুক্ত গাছ থেকে ডগা বা সায়ন সংগ্রহ করতে হবে।
- রোগমুক্ত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন জাতের আম গাছ লাগাতে হবে। যেমন- বারি-১ ও ২, ল্যাংড়া, ফজলী ইত্যাদি জাতের মধ্যে বিকৃতি রোগটি খুবই কম দেখা যায়।
- দৈহিক বিকৃত কুড়িগুলো ভেঙ্গে ফেলতে হবে।
- আক্রান্ত স্থান কেটে ফেলতে হবে।
- বিকৃত মুকুল দেখা মাত্রই কেটে ফেলতে হবে।
- ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১২ গ্রাম হারে ১০ দিন পর পর ৪/৫ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

- মুকুল বের হওয়ার প্রায় ৩ মাস পূর্বে (অর্থাৎ অক্টোবর মাসে) ন্যাপথালিন এসিটিক এসিড (NAA) শতকরা ০.০২ ভাগ করে স্প্রে করলে রোগের তীব্রতা কমে যায়।

৮। ঝুল রোগ (Stood Mould) :

লক্ষণ : ঝুল রোগের আক্রমনে পাতার উপর কালো আবরণ পড়ে। এই কালো আবরণ হচ্ছে ছত্রাকের দেহ (Mycelium) ও বীজকণার সমষ্টি। আমের শরীরেও কালো আবরণ দেখা যায়।

বিস্তার : রোগের বীজকণা ও কর্নিডিয়া বাতাসের মাধ্যমে বিস্তার লাভ করে থাকে। হপার বা শোষক পোকা আমের মুকুলের মারাত্মক শত্রু। এ পোকা মুকুল থেকে অতিরিক্ত রস শোষণ করে এবং মধু জাতীয় এক প্রকার আঠালো পদার্থ যা হার্নিডিউ নামে পরিচিত নিঃসরণ করে। উক্ত হার্নিডিউ মুকুল এবং পাতার উপর পতিত হয়। তার উপর ছত্রাকের বীজকণা জন্মায় এবং কালো আবরনের সৃষ্টি করে। হপার ছাড়াও ছাতরা পোকা (মিলি বাগ) ও স্কেল পোকা হানিডিউ নিঃসরণ করে এবং ঝুল রোগের আক্রমনে সহায়তা করে। হানিডিউ ছাড়া এ রোগ জন্মাতে পারে না।

প্রতিকার ঃ

- হানিডিউ নিঃসরণকারী হপার, মিলিবাগ বা স্কেল পোকা কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে দমনে রাখতে পারলে ঝুল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।
- আক্রান্ত গাছে সালফার গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ভালভাবে স্প্রে করে এ রোগ দমন করা যায়।

৯। দাদ (Scab) :

লক্ষণ : আম মটর দানার মতো হলেই এ রোগের আক্রমণ শুরু হতে পারে। আক্রান্ত আমের শরীর বাদামি রং ধারণ করে, খোসা ফেটে যায় ও খসখসে হয়ে উঠে। আক্রান্ত আমের বৃদ্ধি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং কয়েক দিনের মধ্যে তা ঝরে পড়ে। রোগের আক্রমণে বাড়ন্ত আমের শরীরে বাদামি দাগের সৃষ্টি হয়। অনুকুল আবহাওয়ার দাগগুলো বাড়তে থাকে এবং সম্পূর্ণ আমের শরীর ঢেকে ফেলে। আক্রান্ত আমের চামড়া নষ্ট হয়ে যায়। আমের শরীর খসখসে অমসৃণ হওয়াব কারণে আমের বাজার দর কমে যায়।

প্রতিকার : রোগের আক্রমণ দেখা দেওয়ার সাথে সাথে রোভরাল (প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম) অথবা ব্যাভিস্টিন প্রতি লিটার পানিতে ১ গ্রাম হারে ৭-১০ দিন পর পর ৩/৪ বার স্প্রে করে গাছ রোগমুক্ত রাখা যায়।

উপসংহার : আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আম একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যান ফসল। আমের ফলন ভালো হলে প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানী করা সম্ভব। তাই আমের ভালো ফলন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের উপরোল্লিখিত রোগ-বালাইয়ের দমন ব্যবস্থা মেনে চলা উচিত।

প্রবন্ধকার : প্রকল্প কর্মকর্তা, সেকেন্ডারি এডুকেশান কোয়ালিটি অ্যান্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ) মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

বৈরী জলবায়ুর সবচেয়ে বড় শিকার কৃষি ঃ প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

কাজী রিচি ইসলাম

মানুষের প্রাচীন পেশাগুলোর মধ্যে কৃষিকার্য অন্যতম। অতীতে কৃষিকার্য বলতে মানবিক প্রচেষ্টার দ্বারা চাষাবাদ করে ফসল ফলানোকে বুঝানো হতো। এ প্রসঙ্গে জনৈক বিশেষজ্ঞ বলেন– Cultivating land is known as agriculture.

কিন্তু আধুনিককালে কৃষিকার্য বলতে ভূমি-কর্ষণ, বীজ রোপন, সার প্রদান, পানি সেচ, ফল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, মৎস চাষ, প্রজনন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বনভূমির আবাদ, ও কাষ্ট আহরন, মৌ-মাছির চাষ ও মধু সংগ্রহ, তুত চাষ ও রেশম সংগ্রহ ইত্যাদির মাধ্যমে জীবিকার্জনের জন্য মানুষের যাবতীয় কর্ম প্রচেষ্টাকে বোঝায়।

কৃষি কার্য প্রাচীন পেশা হলেও আজও বিশ্বের অধিকাংশ মানুষ কৃষিজীবী। সুতরাং প্রাচীন পেশা হিসেবে এটি বিশ্বের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত।

কৃষিকার্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতির নির্ভরতা, কারণ কৃষির সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতির যে সমস্ত উপাদানের উপর কৃষি কাজ নির্ভর করে এদের মধ্যে মৃত্তিকা ও জলবায়ু প্রধান। মৌসুমী উৎপাদন– বিভিন্ন ঋতু ও মৌসুমে বিভিন্ন ধরনের ফসল উৎপাদিত হয় বলে কৃষিকার্য অন্যান্য শিল্প হতে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী।

ক্ষেত্রের ব্যাপকতা : কৃষিকার্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর ব্যাপকতা। ফসল ফালাতে প্রচুর জায়গা প্রয়োজন। সারা বিশ্ব জুড়ে দেশে দেশে মাঠে মাঠে ফসল ফলানতে ব্যাপকভাবে কৃষিকার্যক্রম বছরভরে চালিয়া যেতে হয়।

পণ্যের প্রকৃতি : সাধারণত কৃষিপণ্য গুলো ওজনে ভারী ও পচনশীল হয়। ফলে অতি দ্রুত বাজারজাতকরণ করতে হয়।

উৎপাদনে অনিশ্চয়তা : কৃষিকার্য প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল বলে এর উৎপাদনের পরিমান, পণ্য দ্রব্যের গুন ও মান সবসময়েই অনিশ্চয়তা থাকে। ফলে উৎপাদনের পর প্রমিতকরণ (Grading) করতে হয়।

চাষ পদ্ধতি : বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের চাষাবাদ পদ্ধতি চালু রয়েছে। তাই কোথাও জীবিকা ভিত্তিক আবার কোথাও প্রাগাঢ় ও ব্যাপক ভিত্তিক চাষাবাদ পদ্ধতি বিদ্যামান। অন্যদিকে সনাতন এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ও কৃষিকার্য করা হয়। কৃষি হতে সরাসরি প্রাপ্ত পণ্যদ্রব্যগুলোকে কৃষিপণ্য বলা হয়। যেমন : ফল-ফলাদি, আম, কাঁঠাল, লিচু, কলা ইত্যাদি। আরও অনেক কিছু যে গুলো সরাসরি ভোগ করা যায়। আবার কতকগুলোকে আকার পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ কোন কোন কৃষিজ পণ্যদ্রব্য ভোগ্যপণ্য করা গেলেও কিছু কিছু কৃষিজ দ্রব্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আবার এদের কিছু খাদ্য শষ্য (Cereals) কিছু পানীয়, কিছু তৈলবীজ, কিছু ভেষজ এবং কিছু তন্তুজাতীয় শস্য। প্রকৃতি ও ব্যবহারের তারতম্য অনুযায়ী কৃষিজপণ্য কে যে ভাবে ভাগ করা যায় তা হলো :

খাদ্য শস্য : প্রধান খাদ্যশস্য-ধান, গম, যব, ভুট্টা, ওট, জোয়ার ইত্যাদি। অপ্রধান খাদ্যশস্য, আলু, ফলমূল, মসল্লা, ইক্ষু, বীট, সয়াবিন চীনাবাদাম ইত্যাদি।

পানীয় ও ভেষজ শস্য : চা, কফি, কোকো, নারকেল, সিংকেণা ইত্যাদি।

অর্থকারী বা বাণিজ্যক শস্য : তন্তু জাতীয় শস্য-বয়ন শিল্পের কাঁচামাল তুলা, পাট, শন, রেশম, আতশী ইত্যাদি

তৈলবীজ জাতিয় শস্য : তৈল উৎপাদনের কাঁচামাল, সরিষা, সয়াবিন, পামবীজ, তিসি সূর্যমুখী ইত্যাদি।

অন্যান্য বাণিজ্যিক শস্য : রাবার, ইক্ষু, বীট, রেশম, তামাক, বাঁশ, বেত, কাঠ ইত্যাদি।

বাংলাদেশ ২০°৩৪′ হতে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১′ হতে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমাংসের মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি রেখা বাংলাদেশের মাঝখান দিয়ে অতিক্রান্ত হয়েছে। ফলে এটি ক্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত : বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ (৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল)। বাংলাদেশের প্রায় তিনদিকেই ভারত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এদেশের চট্টগ্রাম, বান্দরবান, বাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, কুমিল্লা, সিলেট ও ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব ও উত্তর অংশের কিছু পার্বত্য ও উচ্চভূমি ছাড়া অবশিষ্ট এলাকা অসংখ্য নদনদী বিধৌত পলিমাটিযুক্ত উর্বর সমভূমি।

পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, শীতলক্ষা, কর্ণফুলী, প্রভৃতি নদনদী এবং এদের উপ ও শাখা নদীগুলো (২৩০ টি) উত্তর পশ্চিম দিক হতে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরমুখী। কারণ উত্তরদিক হতে ভূমি ক্রমশ দক্ষিণে ঢালু হয়ে গেছে। ফলে নদীবাহিত পলিমাটি দ্বারা বাংলাদেশের সমতল ভূমি গঠিত। তবে ফরিদপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, সিলেট প্রভৃতি জেলায় ২,৪৬৪টি জলাভূমি (Wet land) রয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের জলবায়ু বিদ্যামান। ফলে ভূগোলবিদগণ জলবায়ুকে ভিত্তি করে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে পৃথিবীকে কয়েকটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করেছেন, এদের কোনটি জটিল আবার কোনটি সহজ। অবস্থান ও উচ্চতার ভিত্তিতে প্রথমে পৃথিবীকে চারটি প্রধান জলবায়ু এলাকায় বিভক্ত করা হয়, এবং পরে বৃষ্টিপাত, আর্দ্রতা, অবস্থান ইত্যাদি অনুসারে তাদের পুণরায় ভাগ করা হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ :

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক পরিবেশগত কারণে হুমকির সম্মুখীন। নানাবিধ দুর্যোগের ফলে বাংলাদেশে নিয়মিত যে সব কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও তার ভিতর উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মানবসৃষ্ট অন্যান্য কারণ' তো আছেই। নিয়মিত ও ব্যাপক প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরিবেশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

গোর্কি, সাইক্লোন, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস— যে নামেই ডাকা হোক না কেন, প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা সাধনই এর কাজ। আর নামগুলোর সাথে সবচেয়ে বেশি পরিচয় সম্ভবত এই লোকালয়ের অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের প্রায় প্রতিবছর এই জনপদ মুখোমুখি হয় প্রাকৃতিক ঘুর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের। এই দুযোর্গ কেড়ে নেয় অসংখ্য প্রাণ, জীবনযাত্রা করে বিপর্যস্ত, হাজার মহাসর্বনাশ। শত কোটি টাকার ফসলের ক্ষতিসাধন ঘটে থাকে।

সাইক্লোনের জন্ম হয় নিম্নচাপের মধ্যে আর নিম্নচাপ হয় বিশাল জলরাশির মধ্যে। যখন জলের তাপমাত্রা কমপক্ষে ২৬-২৭° ডিগ্রী সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। গরম বাতাস হালক-ফলে উপরে উঠে আসে। পৃথিবী সবসময় ঘোরে। আর এজন্য যে বলের সৃষ্টি হয় তা বাতাসের গতিকে ঘুরিয়ে দেয়। সাইক্লোনের

উৎপত্তি/সৃষ্টি এটি একটি বড় কারণ। বঙ্গোপসাগরে অধিকাংশ সাইক্লোনের জন্ম হয় আন্দামানের কাছাকাছি সাধারণত ৫° ডিগ্রী উত্তরের চেয়ে বেশি অক্ষাংশে এটি ঘটে। জলারাশিতে কোথাও নিম্নচাপের সৃষ্টি হলে অর্থাৎ সেখানে বাতাসের চাপ কমে গেলে আশপাশের চারদিক থেকে বাতাস প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে সেখানে ধাবিত হয়। ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর বিশাল জলারাশি– একেবারে উন্মুক্ত! ঐ অঞ্চলে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় প্রবল বেগে ধাবিত হয়ে বাংলাদেশে উপকূলে, দেশের অভ্যন্তর ভাগে পৌঁছে আঘাত হানে। ভৌগোলিক ভাবে পৃথিবীর এই বৃহত্তর ব-দ্বীপ (Delte) টির আকার উপকূলে অনেকটা ফানেলের আকৃতির ফলে আঘাতের পরিমাণ হয় প্রচণ্ড। বাতাসের গতিবেগ বুঝবার জন্য একটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

Scale No	Speed	Description	Characteristice
0	0-1.5 km/hr	calam	Smoke goes Straight up
1	1. 6-5 km/hr	Light air	Smoke blown by wind
2	6-11 km/hr	Light breeze	Wind felt on face
3	12-19 km/hr	Gentle breeze	Extends a light flag
4	20-29 km/hr	Moderated breeze	Raises durt and Loose. paper
5	40-50 km/hr	Strong breeze	Umbrellas hard to hold
6	40-50 km/hr	Strong breeze	Umbrellas hard to told
7	51-61 km/hr	High wind	Diffcult to walk into
8	62-74 km/hr	Gale	Twigs broken off trees
9	75-87 km/hr	Stroge Gale	Chimmey Pots and slatest lost
10	88-101 km/hr	While gale	Trees uprooted
11	102-102 km/hr	Storm	Widespread damage
12	Over 120 km/hr	Hurricane	Extremely violent

সর্বশেষ মারাত্মক ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস (Cyclone Tidal bore) আঘাতে হানে ১৯৯১ সালে ২৯ শে এপ্রিল রাতে। আট ঘণ্টা ধরে চলছে এই ভয়াবহ ঝড়ের তাণ্ডবলীলা। এ সময়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ ছিল ২৪০ কিলোমিটার/ ঘণ্টা। আর সমুদ্রের পানি উপকূলে আছড়ে পড়েছিল ৬ মিটার উঁচু ঢেউয়ের রূপে। এ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে সরকারী হিসেবে মানুষ মারা গেছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার। বেসরকারী হিসেবে প্রায় ৩ লক্ষ। ১৪টি উপকূলীয় জেলার ওপর দিয়ে জানমাল ও ব্যাপক ফসলের ক্ষতিসাধন হয়। সেই গভীর রাতে ঝড়ের ছোবলে সে সব এলাকা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সন্দ্বীপ, হাতিয়া, নিঝুমদ্বীপ, মনপুরা, চরফ্যাশন, চরনিজাম, কুয়াকাটা, সোনাগাজী, চরকান্দিয়া, চরসাহাপুর, কোম্পানীগঞ্জ, চররতনপুর, চরজহীর উদ্দিন, ভোলা, কক্সবাজার, কুতুবদিয়া, চট্টগ্রামের পতেঁঙ্গা সহ অন্যান্য আরও কয়েকটি অঞ্চল। এসব এলাকার বাতাসের গতি ছিল সর্বোচ্চ ২২৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। আর এসব এলাকার অধিকাংশই ৩.৫–৫০০ মিটার পানির নিচে চলে গিয়েছিল। ফসলের ক্ষতি হয়েছিল কয়েক হাজার কোটি টাকা।

১৯৭০ সালে যে ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল তাতে বাতাসের গতিবেগ ছিল সর্বোচ্চ ২২২ কি. মি. পানি উঠেছিল ৩.৫-৫ মিটার উঁচুতে। তখন অবশ্য মানুষ মরেছিল সর্বাধিক প্রায় ৫ লাখ। অনেক গবাদি পশুর প্রাণ নাশ ঘটে। ক্ষেতের ফসল বিনষ্ট হয় ব্যাপক। সেবার চর জব্বার, চর আলেকজান্ডার মনপুরায় স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে এসেছিল মর্মান্তিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ১৮৭৬ সালে এবং ১৯১৯ সালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চল এবং অভ্যন্তরে বিভিন্ন স্থানে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড় দুটিতে জানমাল ও কৃষিজ পণ্যের ব্যাপক ক্ষয় সাধন হয়। আরও ঘূর্ণিঝড় ঘটেছিল ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৮৮ এ সাতটি ঘূর্ণিঝড়ে দেশের নানা স্থানের জনবলের তো প্রাণহানি ঘটে সাথে রয়েছে কয়েক হাজার কোটি টাকার কৃষিজ পণ্যের ব্যাপক ক্ষয়সাধন। ২০০৭ সালে ১৫ নভেম্বর ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় সিডর উপকূল অধ্যুষিত ৩২ লাখ লোকের জনজীবন লন্ডভণ্ড করে। ৫-৬.৫০ মিটার উঁচু দিয়ে বয়ে যাওয়া সাগরের নোনা পানি জানমাল এবং সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পাঁচ লাখ হেক্টর জমির আমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ছয় লাখ টন ধান উৎপাদন কম হয়। ১৮৭৬ সালে হতে ২০০৯ সাল পর্যন্ত বয়ে যাওয়া ঘূর্ণীঝড় আইলা নিয়ে ছোট-মাঝারি-বড় প্রায় ২০০টি সাইক্লোন বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়। এ সব ঘুর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে ৪২টি উল্লেখযোগ্য সাইক্লোন বাংলাদেশে আঘাত হানে। ফলে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে ঘর-বাড়ি বিধ্বস্ত হয়। সড়ক ও জনপদের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। অর্থনৈতিক কার্যক্রম ভেঙ্গে পরে। অসংখ্য গবাদি পশু প্রাণ হারায়। দিগন্ত বিস্তৃত ফসলের মাঠের ক্ষতির পরমাণু লক্ষকোটি টাকায় দাঁড়ায়।

বন্যা বাংলাদেশের সাংবাৎসরিক ঘটনা। বন্যায় ক্ষয়ক্ষতিও নিয়মিত। বাংলাদেশ নদী পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা এবং তাদের শাখা ও উপনদীবাহিত পলি দিয়ে সঞ্চিত এই বিশাল নিম্নভূমির সৃষ্টি হয়েছে। এই নদীগুলির সম্মিলিত পানিপ্রবাহ প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৬০ লাখ ঘনফুট পানি বয়ে আনে। এর উৎস হচ্ছে প্রতিবেশী ভারত, নেপাল, ভূটান ও তিব্বত। জলবায়ুর হিসাব মতে নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত শুষ্ক মৌসুম এবং জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত আর্দ্র মৌসুম। বৃষ্টিপাতের (২৩০০ মি. মি. থেকে ৫৬০০ মি. মি.) শতকরা ৮০ ভাগই হয় বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। এখানে ঘণ্টায় ৪৫০ মি. মি. পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের রেকর্ড আছে। বর্ষাকালের এই অতিবৃষ্টি পানি এবং প্রধান তিনটি নদীর অববাহিকার পানিতে প্রতিবছরই এদেশে বন্যায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। এ দেশে ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৬৯, ১৯৭০, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮৫, ১৯৮৭ ও ১৯৮৮ সালে মারাত্মক বন্যা হয়েছিল। বন্যার পানি ব্যাপক পরিমাণে পাহাড়ী বালি বহন করে আনে এবং বিভিন্ন স্থানে আবাদী জমীর উপর কয়েক ইঞ্চি থেকে কয়েক ফুট পর্যন্ত আস্তরণ ফেলে। এতে জমির প্রকৃতি ও উর্বরা শক্তি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়। নিয়মিত বন্যা জমির ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং নদী প্রবাহ ও আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারে যা পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। বন্যার পানি দীর্ঘ সময় ধরে থাকায় অনেক সময় অনেক গাছপালার গোড়া পচে বা বিবর্ণ হয়ে মারা যায়। এর ফলে ব্যাপকহারে পেঁপে, কাঁঠাল ও তেজপাতা গাছের মৃত্যু উল্লেখযোগ্য। অধিকহারে গাছপালা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার সহায়ক।

প্রবন্ধকার : কাজী রিচি ইসলাম, ১৭/৪. রূপনগর, মিরপুর, ঢাকা।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর

আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

- মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ হাতে কলমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রদর্শনীবস্তুসমূহ সাজানো হয়েছে
- বিজ্ঞান শিক্ষা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন
- কোন প্রতিষ্ঠান থেকে দলগতভাবে জাদুঘর পরিদর্শন করতে চাইলে জাদুঘরের পক্ষ থেকে বিনামূল্যে পরিবহণ (বিশেষ করে ঢাকা শহরে) ও টিকিটে বিশেষ ছাড় এর ব্যবস্থা রয়েছে
- শিক্ষার্থীদের জাদুঘর পরিদর্শন করার জন্য প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জাদুঘর কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হলো

BANGLA Library Dhaka

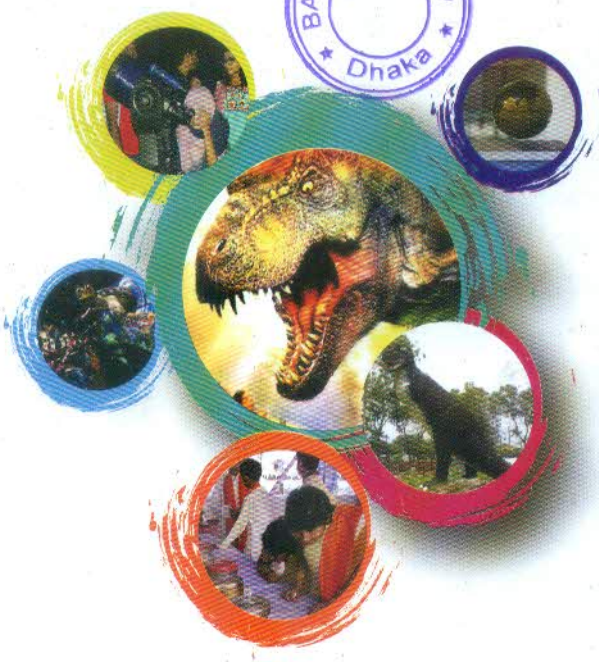

▶ জাদুঘরের গ্যালারি পরিদর্শনের সময়সূচি

- রবিবার থেকে বুধবার সকাল ৯:০০ থেকে বিকাল ৫:০০
  শনিবার সকাল ৯:০০ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০
  শুক্রবার দুপুর ২:৩০ থেকে সন্ধ্যা ৭:০০
  বৃহস্পতিবার সাপ্তাহিক বন্ধ

▶ নিম্নোক্ত বিশেষ দিবসসমূহে জাদুঘরের গ্যালারি খোলা থাকে

- মহান স্বাধীনতা দিবস, ২৬ মার্চ
- বাংলা নববর্ষ, ১লা বৈশাখ
- মহান বিজয় দিবস, ১৬ ডিসেম্বর
- জাতীয় শিশু দিবস, ১৭ মার্চ

জাদুঘরে শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে রাতের আকাশ দেখার ব্যবস্থা রয়েছে

(শুক্র ও শনিবার সন্ধ্যার পর ১ ঘন্টা, আকাশ মেঘমুক্ত থাকা সাপেক্ষে)

এখানে স্বল্প দৈর্ঘ্য 4D movie প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন

www.nmst.gov.bd

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
ফোনঃ ৯১১২০৮৪, ৮১৮১৩২৮